উচ্ছিন্ন উচ্চারণ

দেবেশ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ—১৩৬৩

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
এ. ও. পি. (ইণ্ডিয়া) প্রা. লি.
১২৭/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোড
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

উ ৎ স র্গ

ছোটভাই সিদ্ধার্থ—

চিরায়ুষ্মানকে

'দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে'

—রবীন্দ্রনাথ

লেখকের অন্যান্য বই

জন্ম
শিল্পায়নের প্রতিবেদন
একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন
খরার প্রতিবেদন
দাঙ্গার প্রতিবেদন
সময় অসময়ের বৃত্তান্ত
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত
মফস্বলী বৃত্তান্ত
আত্মীয় বৃত্তান্ত
লগন গান্ধার
মানুষ খুন করে কেন
যযাতি
বেঁচে বর্তে থাকা
ইতিহাসের লোকজন

উচ্ছিন্ন উচ্চারণ



দ্যুলোক

সেই বায়ু আমাদের প্রাণ। আমাদের প্রাণ, সেই বায়ু। আমরা আমাদের বাঁচার প্রতিটি ক্ষণ সেই বায়ুর দ্বারা আবৃত। সেই বায়ু আমাদের রক্তকে শুদ্ধ ও সঞ্চারিত, আমাদের শ্বাসকে শোধিত ও অব্যাহত, আমাদের হৃৎপিণ্ডকে নিত্যস্পন্দিত ও আমাদের ফুসফুসকে মাতৃগর্ভের মত ব্যাপমান, রাখে। এই যে-মাটি-আকাশ ও শূন্যতায় আমাদের জীবনধারণ, এই বায়ু তাকে পূর্ণ, সংযত ও সংযুক্ত রাখে। এই বায়ুকে কেউ কোনো বাধা দিতে পারে না, এই বায়ু দিক থেকে দিকে তার নিজের বহমানতাকে অবার করে নিতে পারে এক অনিবার্য গতিতে, গতির এক অরোধ্য পরাক্রমে, গতির এক অনন্য পরিবর্ততায়। এই বায়ুর কোনো ব্যক্তিগত নেই, অথচ এই বায়ু আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত। যে তার ব্যক্ততায় বা অস্তিত্বে এই বায়ুকে একান্ত নিজস্ব করে নিতে পারে না, সে আর ব্যক্ত থাকে না, অস্তিমান থাকে না। সে, যে-কাল অনন্ত, সেই কালের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। সেই লুপ্তিকে আমরা মৃত্যু

বলে থাকি। এমন নিখিল, এমন সর্বগ, এমন সমষ্টিস্বামিক ও এমন নিয়তঅদৃশ্য বায়ু আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব, ব্যক্তিগত, একান্ত-সম্পদ ও এমন নিয়তস্পৃষ্ট না হলে আমরা মুহূর্তকাল বেঁচে থাকতে পারি না। সেই বায়ু আমাদের প্রাণ। আমাদের প্রাণ, সেই বায়ু।

আমাদের প্রত্যেকের জাগরণ ও নিদ্রা, স্থানুতা ও চংক্রমণ, দণ্ডায়ন ও শয়ন, কঠিনতা ও দ্রবণ যে-চারটি দিক ও সেই চারটি দিকের চারটি মিলনকোণ দ্বারা নিয়ত চিহ্নিত, বর্তিত ও পুনর্চিহ্নিত হচ্ছে—সেই দিকসকল ও কোণসকল, সেই পূর্ব-দক্ষিণ-উত্তর-পশ্চিম দিকসকল ও অগ্নি-বায়ু-ঈশান-নৈঋত কোণের একটির দিকপাল এই বায়ু। কিন্তু সকল দিকপালের মধ্যে একমাত্র এই দিকপালই কোনো দিকসীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়। সে, এই বায়ু, মুহূর্তে, অগ্নি-বরুণ-বহ্নি-নিঋতি-যম-কুবের-ঈশ এই সাত দিকপালের শাসনসীমা লঙ্ঘন করে। সে, এই বায়ু, চরাচরের নির্ণায়ক। যতদূর বায়ু, ততদূর চরাচর।

সেই বায়ু যেমন দিক থেকে দিগন্ত ও দিককোণসমূহ থেকে দিককোণসমূহ ভাঙতে-ভাঙতে ও সমস্ত সীমান্তচিহ্ন লোপ করতে-করতে, সময়ের প্রতিটি ক্ষণ জুড়ে, ক্ষণের প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে ও মুহূর্তের প্রতিটি নিমেষ জুড়ে দেশকে অস্বীকার ও অতিক্রম করে যায়, সেই অস্বীকরণ ও অতিক্রমণই তার স্বভাব, সেই বায়ুর, তেমনি সেই বায়ু কালকে অতিক্রম করে যায়, যে-জীবন দিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কালকে মাপি সেই কালকে অতিক্রম করে যায়, যে-জন্ম দিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে মাপি, সেই জন্মকে অতিক্রম করে যায়। তখন তার, সেই বায়ুর, নাম হয় অনিল। তখন, সেই অনিল, আরও সাতজন বসুর সঙ্গে এক গর্ভহীন অথচ নিয়তদুগ্ধা গাভী লুণ্ঠন করে নিজেকে শাপযোগ্য করে তোলে। সেই নিয়মানুগ শাপে এই অনিল, যে অষ্টবসুর একজন হিসেবে কখনো গর্ভবাসের সুপ্তি ও ভাসমানতা পায় নি, সে, মানুষের ঔরস ও মানুষীর ডিম্বের নিষেকের মধ্য দিয়ে জন্মের এক মর্তক্রমে প্রবেশ করে ও তেমনই জন্মের, যার অসংবরণীয় পরিণতি সেই মৃত্যুতে অবসিত হয়।

সেই বায়ু আমাদের প্রাণ, যার অন্যতর নাম অনিল। আমাদের প্রাণ সেই অনিল, যার অন্যতর নাম বায়ু। আমাদের প্রাণ, এই বায়ু ও অনিল, এই বায়ুই যা ও এই অনিলই যা। আমাদের প্রাণ একমাত্র সেই দেবতা যে জন্মান্তর জানে, গর্ভবাস জানে, জন্ম জানে, মৃত্যু জানে, পুনর্জন্ম জানে, কালান্তর জানে।

এই বাত, যা বায়ু ও অনিল, আমাদের এক নিরবচ্ছিন্ন বাতরশনায় ঘিরে রেখেছে। সেই বাতরশনা থেকে আমাদের মুক্তি নেই। অথচ সেই মুক্তিহীনতার বাইরে আমাদের কোনো জীবন নেই। সেই নিরন্তর বন্দিত্বই আমাদের জীবন। যদি সেই বাতরশনাকে আমরা কয়েকমুহূর্তের জন্যেও ছিন্ন করি, তাহলে আমরা জীবনের ঘের থেকে মুক্তি পাই। সেই মুক্তিকে অনেকে মৃত্যু বলে। সেই মৃত্যুকে অনেকে মুক্তি বলে। মানুষ, মানুষই একমাত্র পারে সেই বাতরশনাকে স্বেচ্ছায় ছিন্ন করতে। মানুষ, মানুষই একমাত্র পারে বাতাসের সেই ঘের ভেঙে ফেলে বায়ুহীনতর ভিতর ঢুকে যেতে। সেই স্বেচ্ছাপ্রবেশকে কেউ মৃত্যু বলে। যে-নিজে সেই বাতরশনাকে ছেদন করে সে তাকে মুক্তি বলে। সেই বায়ু, সেই অনিল, সেই বাত আমাদের প্রাণ। আমাদের প্রাণ সেই বায়ু, সেই অনিল. সেই বাত। সেই বায়ু, সেই বাতের ব্যূহতা থেকে ত্রাণ আমাদের মুক্তি। সেই মুক্তি আমাদের মৃত্যু। যা আমাদের মুক্তি, সেইই আমাদের মৃত্যু। বাক ও অর্থ যেমন অনবচ্ছিন্ন যমজ, পার্বতী-পরমেশ্বরের মত একদেহী অর্ধনারীশ্বর, এই মৃত্যু ও মুক্তিও তাই। এদের, এই মৃত্যু ও মুক্তির ভিতর কোনো বিচ্ছেদ নেই।

যে বায়ু, যে অনিল, যে বাত, সে-ই গার্হপত্য অগ্নি, সে-ই স্বাতী নক্ষত্রের রাজপ্রতিনিধি, সে-ই উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকপতি, সে-ই পবন। সে-ই পবন বহু, তাই পঞ্চপবন। সেই পবন একই সঙ্গে একবচন ও বহুবচন। যে বাতরশনা, সে-ই পবনচক্র। সেই পবন আমাদের ক্ষিপ্তও করে তোলে, ভ্রান্তও করে তোলে। সেই পবন দিক ও কোণ সকলের চিহ্নকে লোপাট করে বলে আমরা পবনক্ষিপ্ত হই, আমরা পবনভ্রান্ত হই। তখন আমরা, সেই পবনচক্র, সেই বাতরশনাকে ভেদ করি। তার ফলে আমরা আমাদের মৃত্যুতে বা মুক্তিতে প্রবেশ করি। যে-মৃত বা যে-মুক্ত, তার ইচ্ছা বা প্রতিশ্রুতিকে আমরা স্বীকার করতে চাই না বলে, আমরা তাকে পবনক্ষিপ্ত বা পবনভ্রান্ত বলে থাকি। আমরা সেই বায়ু, সেই অনিল, সেই বাত-র আরো এক নতুন চিহ্ন দিই, পবন। সেই নতুন চিহ্নের সঙ্গে আমরা আগুনকে যুক্ত করে দিই। এ সেই আগুন, যা আমাদের গৃহগুলিকে আলোকিত করে, আমাদের গৃহবাসিগণের জন্য অন্ন সিদ্ধ করে, আমাদের শীতের আর্তি দূর করে, ও আমাদের গৃহে-গৃহে নক্ষত্রনিঃসৃত নিরাপত্তা আনে। এ-পবনের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক নেই। পবনচক্র আমাদের নিষেধ করে না, রক্ষা করে। যে-বায়ু, যে-অনিল, যে-বাত আমাদের প্রাণ ও আমাদের অপ্রাণ, সে-ইই পবন ও আমাদের গৃহস্থ অগ্নি ও আমাদের রক্ষক। এই অগ্নিতা ও রক্ষণে কোনো মৃত্যু নেই, বিচ্ছেদ নেই।

যে বায়ু, যে বাত, যে অনিল, যে পবন, যে অগ্নি, সে-ই মরুৎ, সেই সপ্তমরুৎ, সেই সপ্তগুণ সপ্ত মরুৎ। সে-ই মরুৎগণ মাতৃপরিচয়হীন। তারা সময়ের কোনো এক স্তরে, পৃথা ও সমুদ্রের পুত্র। তারা, সময়ের অন্যতর কোনো স্তরে, রুদ্র ও পৃশ্নির পুত্র। তারা, অন্য কোনো সময়ান্তরে, দিতির পুত্র। এই যে বায়ু, যে বাত, যে অনিল, যে পবন, যে অগ্নি, যে মরুৎ ও মরুৎগণ, সে, বা তারা, জন্মের আগেই গর্ভ থেকে গর্ভান্তরে গমনের ফলে তাদের প্রাকজন্মবাসকে অস্থির ও অনির্দেশ্য করে তোলে। বহু গর্ভবাসী এই মরুৎগণ, মাতরিশ্বা কর্তৃক চালিত। সে-ই মাতরিশ্বা, যা গর্ভ ব্যেপে থাকে। যা গর্ভদেশ ব্যাপন করে থাকে, সেই মাতরিশ্বা, এই মরুৎগণের চালক। যাদের প্রাকজন্ম গর্ভ স্থির করা যায় না, সেই মরুৎগণ, মাতৃগর্ভেব আলোড়ন স্বরূপ যে-মাতরিশ্বা, তার দ্বারাই চালিত হয়। যাদের জন্মপথ অজ্ঞেয়, এই সে-ই মরুৎগণ, তাদের ধারক গর্ভের দ্বারাই নিয়তচালিত। এই মরুৎগণ, যে বায়ু, যে বাত, যে অনিল, যে পবন, যে অগ্নি তাদের জন্মকালেই দীপ্তিমান, বিন্দুচিহ্নিত মৃগ, যুদ্ধগর্জন ও নানারূপ আয়ুধের সঙ্গে গর্ভ থেকে বাইরে আসেন। অথচ তাদের এমন নিষ্ক্রমণের গর্ভদেশ অচিহ্নিত। অথচ তাদের জন্মের বাহন, গর্জন ও আয়ুধ তাদের, এই মরুৎগণের, অন্তরিক্ষবাসের নিত্যসঙ্গী। যাদের গর্ভবাসকাল তাদের সমস্ত কর্মের নিয়ন্ত্রক, বা, নিয়তি, তাদের, সেই মরুৎগণের, গর্ভ কখনোই নির্দিষ্ট নয়। তারা শুধু সেই নিয়তিটুকু নিয়েই গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, যে-নিয়তি তারা যাপন করবে। তাদের, এই মরুৎগণের যাপনীয় নিয়তি, তাদের, এই মরুৎগণের, গর্ভবাসেই স্থির হয়ে আছে। তাদের, এই মরুৎগণের, নিয়তির জন্যে, তারা, এই মরুৎগণ, গর্ভতেই প্রস্তুত হয়েছে। অথচ, তাদের, এই মরুৎগণের, এই বায়ুর, এই বাতের, এই অনিলের, এই পবনের, এই অগ্নির, শুধু নিয়তি আছে, যে-নিয়তি থেকে তাদের, এই মরুৎগণের কোনো পরিত্রাণ নেই। হায়, এই মরুৎগণ দেবতা। তাই যে-জন্মান্তর তাদের এই নিয়তি থেকে ত্রাণ দিতে পারত, তাদের, সেই মরুৎগণের তেমন কোনো জন্মান্তরও ঘটতে পারে না। কারণ, হায়, দেবতা-মানব-অদেব ও অমানব সব অস্তিত্ব নিয়ে এই যে-পৃথিবী ও অপৃথিবী অধ্যুষিত, সেখানে, হায়, কোথাও, মানব ছাড়া কারো জন্মান্তর ঘটে না। আর সবাইকেই তার নিয়তি নিয়ে জীবনযাপন করে যেতে হয় সেই কাল ব্যেপে, যাকে, কোনোদিন জেনে নিতে পারে না বলে, মানব, অগত্যা অনন্ত বলে। এই পৃথিবীতে ও এই অপৃথিবীতে একমাত্র মানবই পারে তার জন্মের অবসান ঘটাতে, তার বেঁচে থাকার নিয়তি অতিক্রম করে নিজের মৃত্যু ঘটাতে, তার

জীবনাতিবাহনের যতি ঘটিয়ে তার নিয়তিকে অস্বীকার করতে, ও তার জন্মান্তরে প্রবেশ করতে। হায়, মরুৎগণ দেবতা, মানব নয়। হায়, মরুৎগণের জীবন ও নিয়তি মাত্র আছে। হায়, মরুৎগণের মৃত্যু ও জন্মান্তর নেই। হায়, দেবতারা, এই মরুৎগণও দেবতা, নিজেকে ছাড়া অপরকে হত্যা করতে পারে, তেমন আয়ুধ ও সেই আয়ুধপ্রয়োগের শক্তি তাদের জন্মসূত্রেই আয়ত্ত। এই দেবতারা, এই মরুৎগণও দেবতা, নিজেকে ছাড়া অপরকে জন্মান্তরে প্রবেশের শাপ দিতে পারে। অভিশাপের এই শক্তি তাদের জন্মসূত্রেই আয়ত্ত। মানব, একা মানবই পারে শুধু নিজের জন্ম ও জীবনকে অভিশাপ দিতে, ও তার পর মানব, একা মানবই পারে, নিজেকে হত্যা করতে ও নিজের জীবনের নির্ধারিত নিয়তিকে প্রতিহত করতে। মানব, একা মানবই পারে, নিজের জন্মান্তর ঘটাতে। এই বায়ু, এই অনিল, এই বাত, এই পবন ও এই মরুৎগণ আত্মহত্যার ক্ষমতাহীন, জন্মান্তরে প্রবেশের শক্তিহীন, নিজের ও নিজেদের নিয়তিযাপনের অধিকারসর্বস্ব দেবতা এবং দেবতামাত্রেরই বন্দনীয়। মানুষ জন্মান্তরসম্পন্ন ও অনমর বলেই বন্দী। আমরা তাই এই মরুৎগণের বন্দনা করি। আমরা অমরত্বের নিয়তিগ্রস্ত মরুৎগণের বন্দনা করি। আমরা মরুৎগণের, নিয়তি-তাড়িত অমর দেবতাগণের, মরুৎগণও দেবতা, বন্দনা করি। আমরা আমাদের নিয়তিছেদনের ক্ষমতা, আত্মহত্যার অধিকার ও জন্মান্তরে প্রবেশের শক্তিকে ব্যবহিত রেখে আমরা, মানব, এই বায়ুর, এই অনিলের, এই বাতের, এই পবনের, এই মরুতের বন্দনা করি। কারণ, এটাই প্রসিদ্ধ, ও হয়তো অনতিক্রম্যও, রীতি যে মানবই বন্দী ও দেবতাগণ বন্দিত। আর, এটাও প্রতিষ্ঠিত ও চির অনস্বীকৃত সত্য যে এই বায়ু, এই অনিল, এই পবন, এই বাত, এই মরুৎ, এক এবং বহু-বচনে সর্বদাই দেবতা। আমরা সেই দেবতাদের বন্দনার প্রথা পালন করি।

হে বায়ুগণ, অনিলগণ, পবনগণ, বাতরাশি, মরুৎচয়—তোমাদের ভীষণ গতিতে মানব, আমরা, অবনত। বৃষ্টি আস্বাদনে তোমাদের গতি তৃপ্ত হয়েছে। তোমাদের গতিতে, আমরা, মানব, অবনত। কিন্তু তোমাদের জন্মস্থান, ও তোমাদের অন্যতম জননী বলে সংকেতিত, আকাশ, তোমাদের গতিতে অবিচল। তোমরা শব্দের জনক, ও গমনকালে তোমরা জল বিস্তার কর, ও ধেনুদলকে সেই আজানুউত্থিত জলে প্রেরণ কর। ধেনুদল সেই জলে প্রবেশের পূর্বে অসম্মিলিত বহু স্বরে হাম্বা রবে আকাশ পূর্ণ করে। হে ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সপ্ত অনিল, পঞ্চপবন, সপ্তগুণ সপ্ত বাত, অগণিত মরুৎ—তোমরা এখন কোথায়, কখন তোমাদের আগমন ঘটবে, পাপ বড় বেশি শক্তিমান, তাকে

বিনাশ করা যায় না, যেন সে-পাপ আমাদের বধ না করে, যেন সে-পাপ আমাদের তৃষ্ণার সঙ্গে লুপ্ত হয়। তোমাদের রথের নেমি দৃঢ় হোক, রথাশ্বগণ দৃঢ় হোক, বল্গা দৃঢ় হোক। দৃঢ়পদ অশ্বপদবিচিত্র তটবান নদীর তীর দিয়ে তোমাদের যাত্রা অপ্রতিহত হোক। আর সেই গতির অপ্রতিরোধ্যতার সঙ্গতিতে সদ্যপ্রসূতি স্তনবতী গাভীর আহ্বান রণিত, ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হোক। হে বায়ুগণ, অনিলসমূহ, পবনপঞ্চক, বাতরাশি, মরুৎসমবায়—তোমরা কার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোথা থেকে কোথায় চলেছ ? দেবগণ, হে গর্ভনিরপেক্ষ দেবগণ, হে মৃত্যুহীন দেবগণ, হে আত্মাহীন দেবগণ, হে আত্মহননে অক্ষম দেবগণ, হে নিয়তিবাধ্য দেবগণ, হে জন্মান্তরহীন দেবগণ, তোমরাও কি আমাদেরই মত, মানবেরই মত, স্থিরবস্তুকে ভগ্ন কর ও স্থাণুকে চঞ্চল কর, ও পৃথিবীর বন ও বৃক্ষ ও পর্বতের পাশ দিয়ে তোমরা গমন কর ? হে দেবগণ, যে-বাক্যদ্বারা আমরা মানব, তোমাদের, আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমরা কি সেই আমাদেরই স্বভাব আয়ত্ত করতে চাও ? হে দেবগণ, তোমরা শত্রুবিজয়ী, পাপরহিত, সূর্যপ্রতিম দীপ্ত, সত্ত্বপ্রতিম বলবান, বৃষ্টিবিন্দুতে রঞ্জিত হয়েও, আমাদের মত, মানবের মত, মৃত্যু বা আত্মহননক্ষম, জন্মান্তরশীল ও নিয়তিবিরোধী হয়ে উঠতে চাও ? তাই কি হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে মরুৎ—তোমরা আকাশ-পথে তোমাদের মত গতিকালেও নারীদের মত অলঙ্কার ধারণ করে কোনো এক মোহনীয়তা সৃষ্টি করতে চাও, যে-মোহনতায় অভিসার থাকে, যে-অভিসারের শেষে কুঞ্জের নিভৃতি থাকে, যে-নিভৃতিতে দুই দেহের সঙ্গম থাকে, যে-সঙ্গমের শেষে স্বেদমোচনের আলস্য থাকে, যে-আলস্যের শেষে অতৃপ্তি জেগে ওঠে, যে-অতৃপ্তির ভিতর থেকে এক পারাপারহীন বিরহ, হে পবন, হে বায়ু, তোমাদের তাড়িত ও প্রতি মুহূর্তে আকারবিকারে বাধ্য মেঘপুঞ্জের মত, সমস্ত আকাশে হা হা হা হা গতিতে ব্যাপ্ত হয়ে যায় ও দেহের সমস্ত সঞ্চিত জল নিষ্কাশিত করতে বাধ্য হয়ে স্রোত-অপসৃত নদীখাতের মত শীর্ণতা থেকে শীর্ণতরতার দিকে চলে যায়, এমনকী জলশূন্য মেঘরাজিও সঞ্চরণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ? হে আমার, মানবের, দেবগণ, তোমরা সবসময়ই সঙ্গমকামী, তোমাদের সঙ্গমে কোনো বিরতি নেই, ইচ্ছা নেই, শুধু সামর্থ্য আছে। হে আমার, মানবের, দেবতা, তোমাদের সঙ্গমে শুধু ইচ্ছা আছে, শুধু ধর্ষণ আছে। হে আমার, মানবের, দেবতা, তোমাদের ইচ্ছার কোনো প্রত্যাহার নেই, তোমাদের সঙ্গমের শেষে কোনো বিষাদ নেই। হে আমার, মানবের, দেবতা, তোমাদের মিলনে কোনো বিরহ নেই। হে আমার, মানবের, দেবতা, বিরহে মিলনবাসনার কোনো সেই মূলোৎপাটনক্ষম টানের

তীব্রতা তোমাদের জানা নেই, চাঁদের টানের যে-তীব্রতায় এই গ্রহের সমস্ত সমুদ্রের জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, মাটির টানের যে-তীব্রতায় ধূমকেতু রাত্রির আকাশে জেগে থাকে অপেক্ষায়, তারপর অনন্তে বিলীয়মান হয়ে যায়। হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ—মরুভূমিতে গোতম ঋষি যখন পিপাসার্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন তোমরা নিজবলে এক কূপকে তুলে নিয়ে ঋষির ওষ্ঠের কাছে কূপের উপরিভাগ স্থাপন করে সেই কূপের তলদেশকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলে। তোমাদের সেই শক্তিমত্তায় ঋষি গোতমের তৃষ্ণা মিটেছিল। হে আমার, মানবের, দেবতা, তৃষ্ণার তৃপ্তিও তোমাদের ক্ষমতার প্রদর্শন ও প্রমাণ। হে আমার, মানবের, দেবতা, তোমরা সে-তৃষ্ণা জানো না, ঠোঁটের কাছে মন্দাকিনী নেমে এলেও, যে-তৃষ্ণা অমৃতগ্রহণ করে না। হে আমার, মানবের, দেবতা, তোমরা সেই ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি জানো না, যে-শক্তিতে উচ্চারণ করা যায়, আমার প্রেমিক আমার মৃত্যুর কারণ হবে কেন, 'আপহি তেজব পরান।' হায় দেবতাগণ আমার, তোমাদের স্মৃতি নেই, তাই তোমাদের বিরহ নেই, তাই তোমরা জানো না বিরহ কতটাই মিলনার্ত। অমিলন কতটাই মৃত্যুকামী। মৃত্যু মিলনকে কতটাই নিশ্চিত করে, তাই বিষপাত্র অমৃতপাত্র হয়ে ওঠে, 'পঁগ ঘুঁঘুর বাঁধ মীরা নাচী রে', 'বিষ কা প্যালা রাণাজি ভেজা, পিবত মীরা হাসি রে।' জীবন আর মৃত্যুর অন্তর্বর্তী সীমা কত অনায়াসে মুছে যায় যখন মরণের মহোৎসবই হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার এক ও একমাত্র উপায়, 'জীবনদাতা মেতেছ যে মরণমহোৎসবে।'

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ—তোমাদের রথে তোমরা লোহিতবর্ণ অশ্ব যোজনা করো। তোমাদের রথে তোমরা অজিরবর্ণ অশ্ব যোজনা করো। হে দেবতাগণ, তোমাদের যে-রথের নাম নিযুৎ, তোমরা সেই রথে আরোহণ করো। কারণ, হে দেবতাগণ, আমরা তোমাদের বন্দনা করছি। কারণ, বন্দনা গ্রহণের জন্যে, দেবতাকে তার বাহনারূঢ় ও রথারূঢ় হতে হয়। কারণ, বন্দনা গ্রহণের জন্যে, দেবতাকে আয়ুধসজ্জিত ও তার শক্তিপ্রয়োগক্ষেত্র-সম্মুখীন হতে হয়। তাই, হে বায়ু. হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ—আমরা আমাদের বন্দনাশ্লোকটুকুর অনুচ্চারণ নিয়ে, তোমাদের সামনে বা উদ্দেশ্যে, বন্দনাবিধেয় কৃতাঞ্জলিতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও আক্রান্ত হওয়ার মুদ্রায় উপস্থিত। তোমরা সশস্ত্র ও আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হও। হায় দেবতা, আমার, মানবের, তোমরা সশস্ত্র ও আক্রমণক্ষম না হয়ে এমন নিরস্ত্র বন্দনাও গ্রহণ করতে পার না! হে দেবতাগণ, দীপ্তিময়ী উষা ভদ্র বস্ত্র বিস্তার করছে, নব্য রশ্মিতে চিত্র বস্ত্র বিস্তার করছে, হে দেবতাগণ, জলভারবাহী মেঘপুঞ্জ

এখন আকাঙ্ক্ষার সীমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ধেনুসকল দুগ্ধবতী হয়ে এখন দোহনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল। হে আমার, মানবের, দেবগণ, তোমাদের ত্রিভুবন আছে ও প্রয়োজনে তোমরা নতুন ভুবন নির্মাণ করতেও হয়ত পার। আর, আমাদের আছে এই একটিই মাত্র ভুবন। সেই ভুবন থেকেও আমরা ত্রাণ চাই। আমাদের ভুবন থেকে আমাদের ত্রাণ দাও। ত্রাণ দাও। ত্রাণ দাও।

হে বায়ু, হে পবন, হে অনিল, হে বাত, হে মরুৎ—জলনিহিত বিদ্যুৎ, মালার ন্যায় অপেক্ষা করছে। সে-মালা, সভায় উচ্চারিত বাকের ন্যায় শুদ্ধ, ও গৃহবধূর ন্যায় ঈষৎ অপ্রকাশ। সেই মালায় তোমরা শোভমান হও। বৃষ্টি আরম্ভের জন্যে, হে দেবতাগণ, তোমাদের মধ্যে যারা তরুণ, তারা দীপ্তাবয়বা রোদসীকে রথে তুলে নিয়েছে। হে আমার, মানবের, দেবতাগণ, রোদসী তোমাদের ভোগাধিকারভুক্ত নয়। কিন্তু হে দেবতাগণ, তোমরা তোমাদের অধিকার-বহির্ভূত কোনো কিছু গ্রহণ না করে কোনো কিছু দান কর না। অথবা, হে দেবগণ, তোমরা তোমাদের অধিকারের কোনো সীমান্তচিহ্ন স্বীকার কর না। অথবা, হে দেবগণ, তোমরা অধিকার শব্দ থেকে নিষ্কাশিত কোনো অর্থকে নিজেদের সম্বন্ধে প্রয়োগ কর না। দেবতাগণ, দেবতার ভুক্ত হতে কে না চায়? রোদসীর কেশ আলোল, কারণ, তাতেই সে তার নগ্নতাকে, দেবতাদের, তোমাদের, তৃপ্তিকর রূপে ঈষদাচ্ছন্ন করতে পারে। দেবতাগণ, অনুরক্তমনে রোদসী তোমাদের সঙ্গত হতে প্রস্তুত। রোদসী তরুণী ও বৃষ্টি আরম্ভের জন্যে সে, রোদসী, দেবতাগণ, তোমাদের দ্বারা বহুধর্ষিত হতে প্রস্তুত। হায়, দেবতাগণ, ধর্ষণ দেবকর্তৃত্বে ঘটলেও ধর্ষণই থেকে যায়। তোমরা সেই ধর্ষণপ্রস্তুত রোদসীকে নিজেদের রথে স্থাপন করে, তার বিনিময়ে, তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতার অধীন বৃষ্টিপাত ঘটাও। হায়, বৃষ্টিপতনও শক্তি ও ক্ষমতার অধীন। হায়, শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যতীত বৃষ্টিপাতও ঘটানো যায় না। হায়, অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ, জলভারানত তোমার শরীর বারিমুক্ত করার জন্যে কত আক্রমণ, অস্ত্রসজ্জা, রথারোহণ, নারীর ধর্ষণসম্মতি ও রথে অশ্বসংযোজন প্রয়োজন হয়। হে আমার, মানবের, দেবতা, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যে সব শর্তই পালন করা হয়েছে। এবার তোমরা বৃষ্টিপাত ঘটাও, পৃথিবী ও শস্পদল সিক্ত হোক, মাটি রোপণের যোগ্য হোক, ধান্যবীজ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুক, তার উদ্‌ভেদন যাত্রা শুরু হোক।

হে বায়ু, হে পবন, হে অনিল, হে বাত, হে মরুৎ—বলশালী, তরুণ, বৃষকল্প এই যে তোমাদের অশ্বসকল, তারা অন্তরিক্ষে কালহরণ করে না। এঁরা ক্ষিপ্রগতি, এরা গতিবান বলে অরোধ্য। তোমরা অগ্রসর হও।

হে রুদ্রপুত্রগণ, তোমরা কে? কেউ তোমাদের জন্ম জানে না। কেউ তোমাদের গর্ভ জানে না। তোমাদের পিতৃপরিচয়ও কি খুব নিশ্চিত? অথবা, যেহেতু সমস্ত দেবতাকেই পিতৃসম্ভাষ করা যায়, তোমাদেরও তাই এক অবান্তর পিতৃপরিচয়ে কখনো-কখনো চিহ্নিত করা হয়। করা যায় বলে, করা হয়। কিন্তু হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ—তোমরা নিজেরাও কি পরস্পরের জন্মপরিচয় জানো? তাহলে তোমরা, একই গর্ভনিষ্ক্রান্ত ভ্রাতৃগণ যেমন জন্মপরিচয়ের ঐক্যে পরস্পরকে স্পর্ধার লীলায় কালহরণ করেন, তোমরাও সেই ব্যবহার অনুকরণ করো কোথা থেকে? হে দেবতাগণ, তোমরা দেবতাদের মধ্যেও গন্তব্যে শীঘ্রগতি, শোভায় অধিকতম অলঙ্কৃত, ওজস্বান ও উগ্র। তোমরা বিদ্যুতের মতই, শতহ্রদ, অথবা, বিদ্যুৎ তোমাদের মতই শতহ্রদ, অথবা, তোমরা ও বিদ্যুৎ একযোগে শতহ্রদ। তোমাদের প্রিয় সব নাম আছে। সেই সব নামের সম্বোধনে তোমরা অভিলাষবান হয়ে ওঠো। হে আমার, মানবের, দেবতাগণ, তোমরা অগ্রসর হও, তোমরা পৃথিবীর জলবৃদ্ধি করো।

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ—আমরা বংশ পরম্পরায় তোমাদের কীর্তি শুনে এসেছি ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন হোতা ছিলেন, তখন, তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা তাদের প্রতি কী প্রকার অনিবার ছিল ও তোমাদের প্রতি তাদের অর্ঘ ও উপাচার কী পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিল, তাও আমরা শুনে এসেছি। সেই কথা বংশপরম্পরায় আমাদের সন্তানগণও শুনবে ও তাদের সন্তানগণকে শোনাবে ও আমাদের অনুপস্থিতি কালেও পরবর্তী সন্ততিরা সে-কাহিনী পর্যন্ত পৌঁছুবে ও সে-কাহিনীতে নির্দিষ্ট ভূমিকা-অনুযায়ী 'নিজেদের দাঁড়াবার স্থান বা ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করবে। হে আমার, মানবের, দেবতা, আমি শুধু তোমাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে তোমাদের প্রতি, তোমাদের দানশীলতার প্রতি, তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতানির্ভর দানশীলতার প্রতি, আমাদের পূর্বপুরুষগণের যে-বশ্যতা ছিল, আমাদের যে-বশ্যতা আছে, আমাদের উত্তরপুরুষগণেরও সে-বশ্যতা থাকবে। তোমাদের শক্তি ওঁ ক্ষমতার মান্যতার কোনো অপহ্নব ঘটবে না। তোমরা অগ্রসর হও।

হে নভোনেতাগণ, তোমাদের তো নানা কারণেই অগ্রসর হতে হয়। তোমরা যখন পশ্চাদপসরণ কর, তখনো এক ধরনের অগ্রসরণই ঘটে, কারণ, তোমাদের সঞ্চরণের জন্যে চারটি দিক ও চারটি কোণই মুক্ত, তার সঙ্গে ঊর্ধ্ব ও অধও মুক্ত। তাই তোমাদের যা গমন, তাই সঞ্চরণ, তাই সরণ, তাই সমীরণ। যে বায়ু, সেই প্রাণ। যে প্রাণ, সেই বায়ু। যে পবন, সেই গতি। যে গতি, সেই পবন। যে অনিল, সেই নিখিল। যে নিখিল, সেই অনিল। যে সতত,

সেই বাত। যে বাত, সেই সতত। যে অন্তরিক্ষচর, সেই মরুৎ। যে মরুৎ, সেই অন্তরিক্ষচর। যে গতি সেই সমীর, যে সমীর সেই গতি।

হে আমার, আকাশের, মানবের আকাশের, দেবতাগণ, তোমাদের দিন ও রাত তো আহ্নিকগতিনির্ভর নয়। সেই দিনরাতের সীমানাহীন বা সীমাসংজ্ঞাহীন যে-আকাশে তোমাদের, এই আমার, মানবের, দেবতাগণের সঞ্চরণ, সে তো উষাতেও আকাশ, অরুণ যখন ক্ষণিকের জন্যে ঘাড় ঘুরিয়ে উষাকে নিমেষমাত্র দেখতে চান তখনো তো আকাশ আকাশই, অরুণের চোখের সেই ঈষদ্ভ্রম সরণে উষা যে-আকাশে বিলীন হয়ে যান, সেও তো আকাশই, উচ্চরন্ত সূর্য যে-আকাশকে পলে-পলে পরিক্রমা করেন, সেও তো আকাশ, অস্তমান সূর্যের রশ্মি তার অরুণাভার বিস্তার ও সঙ্কোচন ঘটায় আকাশেই, একটি কী দুটি ক্ষত্র যে-রাত্রির অধিকার নিতে উদিত হয় সেও তো আকাশের রাত্রি, নিশার এক-এক যামে চন্দ্রমা যে আতপের এক-এক স্থানাঙ্কে প্রতিরাত্রি ভিন্ন আকারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন সে-আতপও তো আকাশ। হে নভোনেতাগণ, এই আকাশ তোমাদের বিচরণভূমি। এই আকাশ তোমাদের নিজেদের বাসনায় কখনো-বা রণভূমিও বটে। এই আকাশে তোমরা লীলাপরায়ণ, যা কখনো আসঙ্গবিলাস, কখনো আক্রমণ। তোমাদের রথে ধর্ষণযোগ্যা বলশালিনী কোনো নারীকে উত্তোলন না করে তোমরা, এমনকী যা যুদ্ধ বলেই রটিত, সেই যুদ্ধেও অগ্রসর হও না। তোমাদের সম্ভোগ আর সংগ্রামের ভিতর কোনো পার্থক্য নেই। তোমাদের সম্ভোগে যেমন কোনো বিষাদ নেই, তোমাদের সংগ্রামেও তেমনি কোনো পরাজয় নেই।

বিষাদহীন ও পরাজয়শূন্য দেবতা আমার, মানবের, তোমরা সেই আকাশে চরমাণ, যে-আকাশ, আমাদের, মানবের, কাছে মাত্র দৃশ্য। আমার, মানবের, এই পৃথিবীতে ঋতুগণ নিয়তপরিবর্তবান—কখনো প্রাচীন কোনো মহাদ্রুমের পর্ণরাজি মোচিত হতে থাকে, কখনো কোনো পর্বত শিখরে তুষারপ্রান্তর গলিত হয়ে সমুদ্রে পরিবর্তিত হয়, কখনো কোনো নদী তার ঋতুকালে উজ্জীবিত হয়, কখনো কোনো বনতোষিণী লতায় পুষ্পোদগম হয়, কখনো শীতনিদ্রা থেকে ভুজঙ্গ জেগে ওঠে, কোথাও কোনো সমুদ্রে তুষারশৈল স্রোতের তাড়নায় উষ্ণ সৈকতের দিকে ধেয়ে যায়, কখনো আকাশ বেয়ে ধাবন্ত পাখির দল হাজার মাইল দূরে তাদের শৈত্যাবাস খুঁজে পেয়ে ডানা গুটিয়ে আনে, কখনো বিশালকায় মেঘ কপট ছায়ায় আমাদের প্রতারিত করে গগনের প্রান্ত থেকে প্রান্তে ছড়িয়ে যায়, কখনো,'যে বায়ু, যে অনিল, যে পবন, যে বাত, যে মরুৎ, যে সমীর, সে, আকাশ-পৃথিবী ব্যাপ্ত বায়ুপথ বা মরুৎপথের অপরিমেয়তায়

কোনো একক আম্রবৃক্ষের মুকুলসঞ্চারের গন্ধে ভারী হয়ে যায়, প্রান্তর পেরিয়ে মানুষের পায়ে-পায়ে তৈরি একটা তৃণহীন সরণি সেই উদগত মুকুল আম্রবৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন তলায় এসে হারিয়ে যায়। এতটুকু ছায়ার জন্যে মানুষ এতখানি প্রান্তর পেরিয়ে কোথায় হারিয়ে যায়।

যে-ঋতু, যে-ঋতুবদল, আমার, মানবের একান্ত, হে আমার, মানবের, দেবগণ, তোমরা তাও লুণ্ঠন করো। সূর্যদেবতা মেঘরাজিতে লীলাবশে জলসঞ্চার করেন। বায়ু থেকে বজ্রধ্বনি বাজে, অগ্নি থেকে বিদ্যুৎ চকিত হয়। সেই বজ্র ও বিদ্যুতের সঙ্গে মেঘ জলক্ষরণ করতে থাকে। মেঘ তার নামের ধাতুরূপ প্রমাণ করে। মিহ্ ধাতু ক্ষরণার্থক—মেঘ, ধাতুর অর্থ, আহ্নিক গতির ছয় মাস ধরে প্রকাশ করতে থাকে। কখনো ভ্রষ্ট হয় না বলে কবিরা মেঘকে অভ্র নামে আদর করেন। এই মেঘ মহিষ, শূকর ও মত্তগজের আকার নিয়ে পৃথিবীতে নামে এই জীমূত বিদ্যুদগুণহীন, জলধারাময়, নিঃশব্দ ও মহাকায়। আর-এক দল মেঘ বায়ুর বলবর্তী, বলাকাদের গর্ভস্থাপক, বিদ্যুদগুণযুক্ত ও গর্জনপ্রিয়। নিজেদের কামনার বশবর্তী হয়ে পুরা প্রাচীনকালে পর্বতশৃঙ্গগুলি রমণের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরের রমণীদের দিকে আকাশপথে ধাবিত হত আর কামোন্মত্ত পর্বতশৃঙ্গদের আঘাতে-আঘাতে প্রাণিকূল বিপর্যস্ত হত। ইন্দ্র এই কামতাড়িত পর্বতশিখরগুলির পাখা কেটে দেন আর সেই কর্তিত পাখাগুলি বিশালাকার জলধরের বেশে, নানা রূপে, দিগন্তান্তরে শূন্যতান্তরে, ঘোরাকারে ঘুরে বেড়াতে থাকে। পুষ্করাবর্ত এই মেঘ এক-এক কালান্তে বা যুগান্তে সঞ্চিত জলধারা বর্ষণ করে। সে-বর্ষণে কল্পের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়, সংবর্তাগ্নি নিবে যায়, পরাবহ নামক এক বাতাস এই বর্ষণকে আশ্রয় দেয় ও তাদের দেশাভিযানে প্রেরণা দেয় ও তাদের অপ্রতিহত রাখে। তাছাড়াও সমস্ত মেঘের বাষ্পই তো প্রীতিকর—বিশেষত চার দিগ্গজ পর্জন্য। পর্জন্য ও দিগ্গজ মেঘপুঞ্জ থেকে নিঃসৃত হিমকণায় মাটিতে যে-শস্যবৃদ্ধি ঘটে তাকে হৈমন্তী ফসল বলে। পরিবহ নামে মহোত্তম এক বায়ু এদের, চার দিগ্গজ ও পর্জন্যের, আশ্রয়। আকাশের কোনো এক প্রদেশে, হে আমার, মানবের, দেবতা, আমরা, মানবরা, স্বর্গ নামে এক স্থানের কল্পনা করে থাকি, স্বর্গকে আমরা নদীতে-অরণ্যে ও পর্বতে আমাদের এই পৃথিবীর তুল্যই মনে করে নিই। সেই স্বর্গে আমরা, মানবরা, আকাশগঙ্গা, নামে এমন এক নদীকে নিত্যবহমান রাখি যার ধারা একটি মাত্র নয়, বহু, আর বহুর অর্থেই আমরা ত্রিধারা বলে থাকি। যে-পরিবহ বায়ু দিগ্গজ ও পর্জন্যকে আশ্রয় দেয়, সে-ই পরিবহ বায়ুই এই আকাশগঙ্গার ধারক ও তার স্রোতের বাহক। দিগ্গজ

সেই আকাশগঙ্গার বাত্যাতাড়িত জলরাশিকে শুঁড় দিয়ে শোষণ করে, স্বর্গেরও যে-আকাশ থাকে সেই আকাশে, নিক্ষেপ করে। সেই জলকণারাশি আবার আকাশগঙ্গায় গিয়ে পড়ে। এই জলকণাগুলিকেই নীহার বলে।

হে আমার, মানবের, নভোনেতাগণ, সেই দৃশ্যমান আকাশের কোনো দেশে অদৃশ্য সেই স্বর্গের সীমান্তচিহ্নহীনতায় প্রবাহিত আকাশগঙ্গার নীচে এই আমার, মানবের, দৃশ্যমান, স্পর্শবান, আস্বাদ্য, শ্বসিত, গন্ধনিষিক্ত পৃথিবীতে কত পর্বতসানু, কত অধিত্যকা, কত উপত্যকা, কত সমতল, কত গতি, কত বীর্য, কত ওষধি, কত সমুদ্র, কত সিন্ধু, কত জল, কত কৃষি, কত প্রাণ।

হে আমার, মানবের, নভোনেতাগণ, হায়, এ-পৃথিবীর কতটাই তোমাদের অগোচর, তোমাদের পক্ষেও নিষিদ্ধপ্রবেশ, তোমাদের পক্ষেও অজ্ঞেয়।

তোমরা, অন্তরিক্ষচারী ও বিশ্বতোমুখী দেবতা আমার, মানবের, তোমরা যে-পৃথিবীকে দেখতে পাও না ও জানতে পারো না, সেই পৃথিবীর কথা জানো, যদি, হে আমার, মানবের, দেবতা, তোমাদের কোনো শ্রুতি থাকে, কারণ, তোমরা, অন্তরিক্ষচারী দেবতাসকল, নিজেদের ধ্বনিতেই মগ্ন থাক ও এক ধ্বনি থেকে আর-এক ধ্বনি সৃষ্টিতে নিরত থাক। হে বায়ু, হে পবন, হে অনিল, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরা ধ্বনিসৃষ্টি ও স্বকীয় সেই সকল ধ্বনিসম্ভোগ থেকে বিরত হও। তোমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বশ অথচ এটা নিশ্চিত নয় যে, যেমন মানবের, তোমাদের তেমনি, সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে ও সে-সকল ইন্দ্রিয় একই কালে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে। হে মানবের দেবতা, আমার দেবতা, তোমরা প্রতি মুহূর্তে চমৎকার সৃষ্টি করে নিজেরা মুগ্ধ হও ও অপরকে মুগ্ধ কর। সেই মুগ্ধতা সৃষ্টি ও সম্ভোগের অভ্যাস থেকে তোমরা বিরত হও। আর শোনা, শ্রুতির, ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করে তোমরা শোনো, তোমাদের অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের অন্ধ বেগ ও সক্রিয়তা প্রতিহত করে তোমরা শোনো—যাতে সকল প্রাণী নির্মিত হয়, দ্যুলোক সেই অভিমতপুরণসামর্থ্যে পৃথিবীর ভারবহনে যুক্ত ছিল, গর্ভতুল্য জলরাশি মেঘমালার মধ্যে স্থিত ছিল, সেই জলরাশি মেঘ, বায়ু ও রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টি করে বিশ্বরূপবতী পৃথিবীকে দেখেছিল। কিন্তু দেখেনি, এই আমার, মানবের, পৃথিবীতে কত প্রাণী সৃষ্টি হয়েছিল, যারা সৃষ্ট হওয়ার পর জেনেছে, তারা সৃষ্ট হতে চায়নি। নিজেকে, নিজেদের, এই সৃষ্টির বহিরস্থ বলে জেনে নিতেও তো তাদের প্রাণের নিয়মে ও অভ্যাসে প্রাণযাপন করতে হয়েছে। হে আমার নভোনেতাগণ, তোমরা একবার সেই ভয়ঙ্কর ও অকল্পনীয় জীবনযাপনের কথা ভাবো, যদি তোমাদের মনন থাকে, বা স্মরণ করো, যদি তোমাদের স্মরণ থাকে, একটি প্রাণীকে,

মানুষকে, তার জীবনের সম্পূর্ণতা পালন করতে হচ্ছে শুধু এই পুরুষার্থে পৌঁছুতে যে সে যে সৃষ্ট হয়েছে, তাতে তার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আর সে যে-জীবন যাপন করেছে, তা থেকে কোনো অন্বয় ব্যাপকতা পায়নি, তারা নিজেরাও নিজেদের জীবন পাঠ করে নিতে পারেনি তা ক্রমেই এমন দুর্ভেদ্য লিপিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই আস্বাদ্যমান ও পরিদৃশ্যমান যে-জগত আদিত্য ও চন্দ্রমা ও নক্ষত্রমালা দ্বারা আলোকিত সে-জগতে কত প্রদেশ আছে যা অসূর্য। হে আমার, মানবের, দেবগণ—কত আর্তিতে ও ভয়ে, সেই অসূর্যের ভয়ে ও সেই ভয় থেকে উত্থিত আর্তিতে, কত মানব, কতবার, কত দেবতার কাছে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছে—আমাদের ধর্মহেতু আমাদের সমস্ত ভুবন থেকে রক্ষা করো, আমাদের ধর্মহেতু অসূর্য হতে আমাদের রক্ষা করো।

দেবতা আমার, মানবের, এ কোন ভুবন, যার সমগ্রতা থেকে ত্রাণ পেতে, আমাকে,মানবকে, তার জীবনের, ধর্মের, সমগ্রতাকে মূল্য দিতে হয়? দেবতা আমার, মানবের, কোন সে অসূর্য, যার অন্ধকার থেকে ত্রাণ পেতে, আমাকে, মানবকে, তার জীবনের, ধর্মের, সমগ্রতাকে মূল্য দিতে সম্মত থাকতে হয়? দেবতা আমার, মানবের, তাহলে আমার, মানবের, জীবন বলতে কি বোঝায় ভুবনের এক ভগ্নাংশ আর অসূর্যের এক পূর্ণতা? দেবতা আমার, মানবের, তোমাদের শত বেদ, শত পুরাণে, শত কাহিনীতে ব্যক্ত এ কোন সৃষ্টিতত্ত্ব, যার সমগ্রতা, প্রাণীর, মানবের, অনধিগম্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত? এ-অসূর্য এই সৃষ্টির কোন সে প্রদেশ, যেখানে, হায়, মানুষ প্রবেশ করতে চায় না তবু তাকে প্রবেশ করতে হয়। আমার, মানবের, সেই অনিবার্য অসূর্য-প্রবেশ থেকে পরিত্রাণের জন্যে, দেবতা আমার, মানবের, কত যজ্ঞে কত সোমে কত দেবতাকে আহ্বান করা হয়েছে? কত যজ্ঞে কত অগ্নিতে হবি অর্পণ করা হয়েছে? সৃষ্টির কোন সে অব্যবহিত অন্ধকার, যা থেকে, আমার, মানবের কোনো নিষ্ক্রমণ নেই, শুধু প্রবেশ আছে। সে-প্রবেশের অধিকার আমি, মানব, অর্জন করিনি। আমাদের ভিতর, মানবের ভিতর, দুজন, বা, একজন, সেই অসূর্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে।

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর, সেই অসূর্যপ্রবেশের মানবকথা, আমার, মানবের, আত্মকথা, তোমাদের শোনাব। দেবতা আমার, মানবের, তোমাদের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কত বেদ, কত পুরাণ রচিত হল, এবার রচিত হোক মানবের মৃত্যুপুরাণ।

এ অসূর্য কোথায়, হায়, দেবতা আমার, মানবের, তোমরা সর্বজ্ঞ ও সর্বত্রগামী হয়েও কোনোদিন জানতে পার না, এ অসূর্য কোথায়? আর যে-

ঋষিগণ নবীনতর ছন্দে তোমাদের স্তুতি করেন ও তোমাদের মানবযজ্ঞে আহ্বান করেন, তাঁরা দেবতাদের তুষ্টির প্রয়োজনে নতুন-নতুন শব্দের প্রদেশ নির্মাণ করলেও, তাঁরাও জানেন না। প্রেতির পর মানুষ যেখানে যায় সেই অন্ধ তমসে আবৃত লোকই কি অসূর্য? সেই বারুণী রাত্রির শূন্যতাই কি অসূর্য? অথচ দেবতাগণ ও ঋষিগণ জানেন না, মৃত্যুর পর, জীবন থেকে প্রয়াণের পর মানুষ কোথায় যায়? দেবতা আমার, তোমরাই তো চিরকাল মানবের আরাধ্য। মানুষের ঋষি মৃত্যু থেকে অমৃতের কথা ভাবতে পারেন, তমসা থেকে জ্যোতির কথা ভাবতে পারেন, মর্ত থেকে উত্তরণের কথা ভাবতে পারেন। হায়, মানবঋষি তাঁর কল্পনায় কখনো অমৃতলোক থেকে মৃত্যুলোকে যাত্রার ছন্দ রচনা করতে পারেন না, জ্যোতি থেকে তমসায় গমনের ছন্দ বচনা করতে পারেন না, মর্ত থেকে অবতরণের ছন্দ রচনা করতে পারেন না।

দেবতা আমার, মানবের, তাহলে, মানব, আমি, কি মৃত্যুর আগেই, প্রেতির আগেই সেই অসূর্যে প্রবেশ করি, যে-অসূর্যের কোনো এক প্রদেশে মৃত্যু ঘটে যায়? তাহলে অসূর্য, বারুণী রাত্রির তমসা নয়, সেই তমসা যার ভিতর কোথাও বারুণী রাত্রি গুপ্ত থাকে। সেই অসূর্যে প্রবেশের আগে মানব তাব নিজের মৃত্যুর ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। এ অসূর্য একমাত্র সেই মানুষের প্রবেশাধিকারভুক্ত যে আত্মঘ্ন হওয়ার মত আত্মশক্তি সংগ্রহ করতে পারে। হায়, দেবতা আমার, মানবের ! তোমার মতই মানবও জীবন আকাঙ্ক্ষা করে, ভোগ আকাঙ্ক্ষা করে, সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করে। তাই, দেবতা আমার, মানবের, তোমার মতই মানব বেঁচে থাকাকেই আত্মচেতনা ভাবে আর মৃত্যুকে ভাবে আত্মনের অচেতনা। হায়, দেবতা আমার, মানবের ! মৃত্যুর যত সন্নিকটে মানুষ যায়, সে, ততই বেশি করে প্রার্থনা উচ্চারণ করে, হে সূর্য, তোমাকে শত শরৎ দেখব, শত শরৎ বেঁচে থাকব, শত শরৎ ধরে জ্ঞানবান হব, শত শরৎ ধরে আরোহণ করব, শত শরৎ ধরে পুষ্টি লাভ করব, শত শরৎ ধরে জন্ম দেব, শত শরৎ সমৃদ্ধ হব, শত শরৎ সমৃদ্ধ হব—সেই আয়ুষ্কামী মানবের ঋষি বা দেবতা কী করে অনুভবে আনতে পারে এই গোপন প্রতিশ্রুতি, নিজের কাছে নিজের এই একান্ত শপথ—আমার জীবনের এই শরৎ যেন আর আবর্তিত হয়ে ফিরে না আসে, আমার লব্ধ জ্ঞান যেন এইখানে সমাপ্ত হয়, আমার চয়মান অভিজ্ঞতা যেন আরো সঞ্চিত হয়ে না ওঠে, আমার শরীরের সকল পুষ্টি যেন বিনষ্ট হয়ে যায়, যে-জনকত্ব আমি ইতিমধ্যে লাভ করেছি তা যেন ধ্বংস হয়ে যায়, আমার সমস্ত সম্পদ যেন ঋণে পরিণত হয়, আমার

সমস্ত সম্ভোগ যেন বন্ধ্যাতায় অবসিত হয়, আমার জন্মদিন যেন ফিরে না আসে, আমার এ শরীর ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক?

হায় দেবতা, আমার, মানবের, হায় মানবের ঋষি, মানুষের নিরায়ুবাসনার সে-মন্ত্র আর-কোনোদিন লেখা হল না। আত্মহত্যার সেই অপরিমেয় শক্তিকে ভয় পেয়ে মানুষ শুধু বিধান তৈরি করল দেবতার নামে—আত্মনিহত মানুষ সেই সব লোকের দিকে চলে যায় যেখানে অন্ধকার ভেদ করা যায় না।

হে দেবতাগণ ও ঋষিগণ, তোমরা মন্ত্রের শোধন করো: অসূর্য হচ্ছে সেই প্রদেশ, যেখানে শুধু তাদেরই প্রবেশ ঘটে, যারা সেই তমিস্রার কোনো এক অনির্দিষ্ট ও অগোচর স্থানে, নিজেকে নিজে হত্যা করতে পারে।

যে প্রাণ, সেই বায়ু। যে বায়ু, সেই অনিল। যে অনিল, সেই পবন। যে পবন, সেই বাত। যে বাত, সেই মরুৎ। যে মরুৎ, সেই সমীর। হে প্রাণ, হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—এ-কাহিনী সেই এক যাত্রীর কাহিনী যে নচিকেতার মত প্রেতদেশে প্রবেশ করেছে কিন্তু বর নিয়ে ও ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেনি, কারণ, সে তার পিতা বা পালয়িতা কর্তৃক এমন ভর্ৎসিত হয়নি, 'তোমাকে আমি যমকে দিলাম', কারণ, সে কোনো পিতৃসত্য বা পিতৃতুল্যের সত্যরক্ষার জন্যে মরণযাত্রায় যায়নি, কারণ, তার এমন কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না যার উত্তর সে জীবন থেকে না পেয়ে মৃত্যুর দেশে গিয়েছিল। সে চেয়েছিল, নিজেকে নিয়ে সমস্ত জিজ্ঞাসার অবসান, সে চেয়েছিল নিজের শরীরের ধ্বংস, সে চেয়েছিল তার নিজের নিরায়ু, সে চেয়েছিল তার নিজের জীবনের যে-দীর্ঘ আয়ু অবশিষ্ট ছিল তার এক সমূহ অবসান।

আত্মহত্যার ও অসূর্যের এই কাহিনীর শ্রোত্রোদ্দিষ্ট রূপে আমি তোমাদেরই আহ্বান করছি কেন? তোমাদের, দেবতাদের? দেবতাদের মধ্যেও আবার বায়ু, অনিল, পবন, বাত, মরুৎ ও সমীর এই সকল দেবকে? দেবতাগণের শ্রুতির জন্যে যে-কাহিনী বয়ন করা হয়, সে-কাহিনী থেকে পাপ স্খলিত হয়ে, অমৃত প্রবেশ করে, বলে? হে আমার, মানবের, দেবতাগণ, তোমরা সকলেই তো স্বকৃতপুণ্যে পুণ্যবান। কী এমন কাহিনী থাকতে পারে, যা শ্রবণের ফলে তোমরা আরো পুণ্যবান হয়ে ওঠো? দেবতাকেও পুণ্যবান করব, আত্মহননের এই মানবিক কাহিনীর কি এমন কোনো উচ্চাশা থাকতে পারে?

অথবা আমার প্রথম অনুমানটিই সত্য—আমি কি এই কাহিনীর ওতপ্রোত পাপ স্খালন করতে চাই? আমার অজ্ঞাতেই আমি কাহিনীকে হব্য ও সোম হিশেবে প্রস্তুত করে তোমাদের আহ্বান করছি? তোমরা এ-কাহিনী শ্রুতিতে

গ্রহণ করে, নিজেকে নয়, এই কাহিনীকে পুণ্যবান করবে ? কারণ, হে দেবতা আমার, মানবের, তোমরা তো জানো, পুণ্যবান কাহিনীর শ্রোতার পুণ্য, শ্রুতি থেকে শ্রুত কাহিনীতে প্রবেশ করে। আমার এই কাহিনীকে, এই আত্মহননের কাহিনীকে, পুণ্যবান করব, এমন কোনো উচ্চাশা কি এই কথনে নিহিত আছে ?

হে আমার, মানবের, দেবগণ, না, কোনো পুণ্যরচনার উদ্দেশ্য এ-কাহিনীর নেই। আমরা আহুত দেবতাদের শ্রুতিকে পুণ্যবান করতে চাই না। আমরা দেবতাদের শ্রুতিদ্বারা এ-কাহিনীকে পুণ্যবান করতে চাই না। কারণ, হে দেবগণ, এ-কাহিনী পাপেরও নয়, পুণ্যেরও নয়। এ-কাহিনী পাপক্ষালনেরও নয়, পুণ্য-অর্জনেরও নয়। এ-কাহিনীর বক্তা, বা, কাহিনীস্থ মানব-মানবী, পাপীও নয়, পুণ্যবানও নয়। এ-কাহিনী মানবের বিপরীত জীবনের কাহিনী, এ-কাহিনীর মানব-মানবী, মানবের সেই বিপরীত জীবন যাপন করেছে, যে-বিপরীতে আয়ুর বদলে অনায়ু, সূর্যের বদলে অসূর্য, বেঁচে থাকার বদলে মৃত্যু মানুষের অশিষ্ট থাকে। হে দেবগণ, এই কাহিনীতে কোনো পূর্ণ নেই, কোনো পূর্ণ থেকে এই কাহিনী উপচিত হচ্ছে না, এ-কাহিনী কোনো পূর্ণের এমন উপচয়িত অংশ নয়, যার আস্বাদনে সেই পূর্ণের আস্বাদন পাওয়া যাবে ও সেই পূর্ণতা থেকে পূর্ণতা উপচিত হয়ে পূর্ণতাই অবশিষ্ট থাকবে—এমন কোনো আশ্বাস এ-কাহিনীর অবসান থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে না। অনন্ত শূন্যতাকে পূর্ণ করে আছে অনন্ত প্রাণ—অবস্থানের এই চিরকালীন বিন্যাস এ-কাহিনীতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল : অনন্ত প্রাণকে পূর্ণ করে আছে অনন্ত শূন্যতা। যে প্রাণ সেই বায়ু, যে বায়ু সেই নিখিল, যে নিখিল সেই অনিল, যে অনিল সেই পবন, যে পবন সেই বাত, যে বাত সেই মরুৎ, যে মরুৎ সেই সমীর। হে বায়ু, হে প্রাণ, হে নিখিল, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরা, একমাত্র তোমরাই তো এই অপ্রাণের কাহিনীর শ্রোতা হতে পারো, হে আমার, মানবের, দেবগণ, একমাত্র তোমাদের শ্রোত্রই তো এ কাহিনীর যোগ্য হতে পারে, কারণ এ-কাহিনী তো অপ্রাণের কাহিনী। যা অপ্রাণ, সেই তো অবায়ু, যা অবায়ু, সেই তো অনিখিল, যা অনিল, সেই তো অননিল, যা পবন, সেই তো অপবন, যা বাত, সেই তো অবাত, যা মরুৎ সেই তো অমরুৎ, যা সমীর সেই তো অমীর।

হে আমার, মানবের, নভোনেতাগণ, তোমরা, এই শূন্যতার ও আত্মহত্যার কাহিনী শ্রবণে আহুত হয়েছ, কারণ, এই কাহিনী এমন এক মিলনেরও কাহিনী যা থেকে মানবগর্ভ নির্মিত হয়, এই কাহিনী এমন এক জন্মেরও কাহিনী যা থেকে মানুষ মৃত্যুতে নিষ্ক্রান্ত হয়, এই কাহিনী এমন এক শৈশবের কাহিনী শিশুর স্মৃতিহীন ও সম্ভাবনাহীন নন্দনে যা, হায়, দেবগণ, তোমাদেরও, ঈর্ষণীয়,

কারণ, দেবতারা আজন্মই দেবতা, তাদের কোনো শৈশব থাকে না, এই কাহিনী এমনই এক বিরহের কাহিনী যা আদি নীহারিকাপুঞ্জ থেকে বিশ্লিষ্ট গ্রহ ও নক্ষত্ররাজির মত পরস্পর চিরবিচ্ছিন্ন ও ভগ্নসেতু, অথচ যে-গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি সেই আদি নীহারিকাপুঞ্জের অন্তর্গত আকর্ষণের অবশেষটুকু দ্বারাই নিজেদের কক্ষপথে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। হে দেবগণ আমার, মানবের, তোমাদের কোনো বিরহ নেই। তোমরা এই বিরহের কাহিনী শোনো—চাঁদের টানে এই গ্রহের সমস্ত জলরাশি যে-বেগে আকাশের দিকে উত্থিত হয় ও সৈকতগুলিকে আকাশ ভেবে আছড়ে পড়ে। হে আমার দেবগণ, সমুদ্রজল আর চোখের জলের অন্তর্গত বিরহ কি সূর্যোদয়ের মতই সত্য নয় ও সেই সপ্তসমুদ্রব্যাপ্ত জলরাশি আর মানুষের নিয়ন্ত্রণাতীত ইন্দ্রিয় চোখের একটি সঙ্কীর্ণ জলরেখার ভিতর কি কখনো কোনো মিলন সম্ভব? অথচ চোখের ও সমুদ্রের জল কি উভয়ের ব্যতিহারী নয়? হে আমার, মানবের, বিরহবোধহীন দেবগণ, মানুষের চোখের ভিতর সমুদ্র ও সমুদ্রের ভিতর মানুষের চোখ নিহিত না থাকলে কি মানুষ কাঁদতে পারত ও সমুদ্র প্রতিদিন জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হতে পারত? হায় আমার, মানবের, বিরহহীন দেবগণ, তোমাদের নয়ন কখনো এক, কখনো দুই, বা কখনো দুইয়ের অধিক, কিন্তু হায়, আমার, মানবের, দেবগণ, তোমাদের নয়নের সংখ্যা একের ন্যূনই হোক আর শতের অধিকই হোক, সেই সব নয়নে বা অনয়নে কোনো নিমেষ থাকে না। হায়, আমার, মানবের, দেবগণ, তোমরা এতই স্থিরলক্ষ ও নিবদ্ধদৃষ্টি যে যা দেখ তা না-দেখার উদ্দেশ্যে, কিংবা যা দেখার অতীত তা দেখার উদ্দেশ্যে, তোমাদের চোখের নিমেষগুলিকে কখনোই, পূর্ব দেশ থেকে আগত বায়ুতে সদ্যোদ্ভিন্ন খেতের ধানের মত একদিকে হেলিয়ে, পরমুহূর্তেই বিপরীতে হেলিয়ে, দৃষ্টির আবর্ত তৈরি করতে হয় না। শৈশবহীন হে দেবগণ, আমার, মানবের, বিরহহীন হে দেবগণ, আমার, মানবের, নিমেষপাতহীন হে দেবগণ, আমার, মানবের, অশ্রুপাতহীন হে দেবগণ, আমার, মানবের—তোমাদেরই তো আমি আহ্বান করি, অসূর্যের ও আত্মহত্যার এই কাহিনীর সঙ্গে মিলনের, জন্মের, বিচ্ছেদের ও চোখের জলের এই কাহিনী শুনতে তোমরা এসো। হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—এ-কাহিনীতে গান্ধারীতুল্যা বহুপ্রজননক্ষমা নারী বন্ধ্যা হয়ে যায়, রামচন্দ্রতুল্য বালকবীর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে যায়, অর্ধনারীশ্বর মিলনের মাঝখানে দুই গ্রহের অন্তর্বর্তী বিচ্ছেদ সঞ্চারিত হয়ে যায়, ভূতসকল অর্থাৎ যা কিছু জাত, তা যে-আনন্দ থেকে ক্ষরিত তা এক চির-অনন্দিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—শুধু তোমাদেরই কেন আহ্বান করছি, কেবল তোমাদের নিয়েই এই শ্রোত্রমণ্ডল রচনা করে তুলতে চাই কেন, তোমরাই কেন আহুত হবে এমন এক কাহিনীর শ্রোত্রতে, যে কাহিনী অপ্রাণ, অসূর্য, অমিলনের কাহিনী? মিলন, জন্ম, লালন, বিরহ ও আত্মহত্যার কাহিনী?

কারণ, হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরাই তোমাদের বায়ুপথে, অনিলায়নে, পবনগতিতে, বাতসরণিতে, মরুৎযাত্রায় ও সমীরহিল্লোলে আমাদেব সংযুত বাখো ও প্রাণবান রাখ, আমাদেব উৎসুক ও সক্রিয় রাখ। এ-কাহিনীতে তো সেই মানবসংযোগ ঘটেছে, সেই মানবনন্দন ঘটেছে। তোমরা, হে আমার, মানবের, নভোনেতাগণ, তোমরা ছাড়া সেই মিলনবাসর বা জন্মগৃহ পূর্ণ হয়ে উঠবে না। তাই, তোমাদেরই আহ্বান কবি, তোমাদেরই আহ্বান করি। তোমরাই তো আমার, মানবের ও সেই আমার নারীর, মানবীর ভিতর একমাত্র সংযোগ যা স্পর্শনীয, শুধুই অনুভববেদ্য, কিন্তু প্রত্যক্ষত দৃশ্য নয় বা শ্রাব্য নয। হয়তো গগনের শূন্যতার মেঘনির্মিত উচ্চাবচতায়, বা মেঘের গমনাগমনে, বা সেই গমনাগমনের ফলে আলোর তরতমতায় তোমাদের গতিপথ কেউ পরোক্ষ অনুমান করতে পারে। সেই অনুমানের চাইতে অতিরিক্ত কোনো প্রত্যক্ষণ বা শ্রবণ ঘটে না, এমনকী যারা নিজেরাই অদৃশ্য, সেই দেবতাদেরও। অদৃশ্যেরও অদৃশ্য তোমরা আমার, মানবের, সঙ্গে, আমার নারীর সেতুবন্ধ রচনা করো, প্রাণবায়ুর সেতুবন্ধ। হে আমার দেবতাসকল, মানবের মানবীর, তোমরা তোমাদের নিখিলব্যাপ্তিকে কত, কতই-না, সঙ্কীর্ণ করে আনতে পারো এক মানব ও মানবীর ভিতর, যে, অন্তর্জলীশায়ী মানুষ যেমন নদীর জলীয় মুগ্ধ হাওয়া থেকে এক নিশ্বাস পরিমাণ বাতাসও নাসারন্ধ্র ও ফুসফুসের মধ্যে শরীরের এই অতিক্ষুদ্র নালীটুকুতে সঞ্চার করে দিতে পারে না, সেই মানব ও মানবী এই চরাচরপূর্ণ বাতাস ত্যাগ করে শুধু তাদের মুখমণ্ডলের সম্মিলনে বন্দী বাতাসকেই তাদের শ্বাসগ্রহণের একমাত্র উৎস বলে গ্রহণ করতে পারে ও হে আমাদের, মানব-মানবীর, দেবতা, সেই বন্দী বায়ুকে নিজেদের কখনো হ্রস্ব, কখনো দীর্ঘ, ও ক্রমেই তপ্ত শ্বাসে উষ্ণ করে তোলে। হে আমাদের, মানব-মানবীর দেবতা, একমাত্র তোমরাই তো সে-মিলনকে সম্পূর্ণ হতে দিতে সমস্ত জলের বাষ্পীভবন স্থগিত রাখো।

এ তো সেই মিলনের কাহিনী। হে আমাদের মৈথুনের সম্পূর্ণতার দেবতা, তোমরা ছাড়া এ কাহিনীর শ্রোত্রে আর-কে আহুত হতে পারে?

আর যখন আমরা, মানব-মানবীরা, মৈথুনে লিপ্ত নই, ও আমাদের পক্ষে সহ্যের অতীত দূরত্বে পরস্পর থেকে স্থিত, তখন, তোমরা, হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর, তোমাদের বায়ুপথ, অনিলায়ন, পবনসরণি, বাতপন্থা, মরুৎরথ্যা ও সমীরবীথি দিয়ে আমাদের যুত রেখেছিলে। গন্ধবহ তোমরা, আমাদের দুজনের শরীরের ভিতর থেকে উত্থিত সেই সকল সুবাস আমাদের দুজনের ভিতর বিনিময় ঘটাচ্ছিলে, যে-সুবাস এমনকী যার শরীর থেকে উত্থিত, সেও পায় না, শুধু অপরজন পায়, যে-জন তার শরীরের বাইরে থেকে সেই শরীরকে নিজের শরীরের পরিপূরক করে নিয়েছিল। গন্ধমত্ততায় যাদের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা, সেই মদমত্ত কস্তুরী মৃগকেও তোমরা পরাজিত করেছিলে। কস্তুরীমৃগ তার মত্ততাতে ক্রমেই একা হয়ে যায় ও সে তার মত্ততার উৎস জানে না। হে গন্ধবহ দেবগণ, আমরা মানব-মানবী, আমাদের দুজনের ইন্দ্রিয়াধিক ইন্দ্রিয়ের গন্ধ জানি, উৎস জানি, ও সেই গন্ধও আমাদের নিরন্তর মিলনের দিকে অপ্রতিহত টেনে নিয়ে যায়। হে দেবতাগণ আমাদের, মৈথুনকামী মানব-মানবীর, তোমরা ছাড়া আমরা পরস্পরের শরীরের সুবাস এমন শরীরাধিক জানতে পারতাম না।

এ তো সেই মিলনের কাহিনী। হে আমাদের দূরত্বমোচনকারী দেবতা, তোমরা ছাড়া এই কাহিনীর শ্রোত্রে আর কে আহুত হতে পারে?

এ এক জীবৎকালের মধ্যেই আর-এক জীবৎকালের প্রবেশের মত যখন আমাদের ভিতর, মানব-মানবীর ভিতর, সেই অপ্রতিবিধেয় ও অমোঘ বিরহ ঘটেছিল, যা হয়তো বিদ্যুৎখণ্ডিত আকাশের মত অন্ধ ও চকিত, যা হয়তো ভূকম্পনে ফাঁক হয়ে যাওয়া সমতলের মত অনুমানেরও অতীত ও অক্ষহীন, যা মৃত্যুর আঘাতের মত কোনো পরিণতিকে ত্বরায়িত করে না, অথচ মৃত্যুর যন্ত্রণাকে স্থায়ী এক ব্যাপ্তি দেয় মানবদেহের পদতল থেকে শিরোমধ্য পর্যন্ত, অথচ বস্তুত যা সকল মিলনেরই ওতপ্রোত, ও যা সকল মিলনের ধ্রুব পরিণতি, যা অতিক্রমণের কোনো উপায় বা ক্ষমতা মানুষ আয়ত্ত করতে পারেনি, যে-বিচ্ছেদ সেই মিলনের তুলনায় সব সময়ই অপরিমেয় অনন্ত, এমনকী মৃত্যুতেও যে-বিরহের অবসান ঘটে না, তখন, হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর, তোমরাই তো সেই বিরহকে সেই মিলনেরই একাত্ম করে নিতে পেরেছিলে ও সেই বিরহকে এক পরম বিচ্ছেদে পরিণতি দিয়েছিলে। কারণ, হে আমাদের, মানব-মানবীর, দেবতাগণ, একমাত্র তোমাদেরই আছে মুহূর্তে গতিমুখ পরিবর্তনের ক্ষমতা, একমাত্র তোমাদেরই আছে নিমেষে দিক পরিবর্তনের শক্তি, একমাত্র তোমরাই পার এক ঊর্ধ্ব-

অধঃ দণ্ডিত শূন্যতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে নীচে নেমে যেতে-যেতে, বা ওপরে উঠে যেতে-যেতে, পলকে আরোহণ বা অবতরণ শুরু করতে। আর, তার ফলে, হে নভোনেতাগণ, একমাত্র তোমরাই পারো প্রতিটি মানবকে প্রতিটি মানবীকে তার শ্বাসপ্রশ্বাসসহ এক বায়ুকারায় আবদ্ধ করে দিতে, যে-কারা থেকে তার কোনো ত্রাণ নেই, যে-কারা ছাড়া তার কোনো জীবনও থাকে না। হায়, আমার, মানবের, আমাদের, মানব-মানবীর, দেবতাগণ, এক তোমরা, যারা দিগন্ত ও দিগন্তের অন্তর্বর্তী শূন্যতাকে লুণ্ঠন দ্বারা ধ্বংসের শেষে একজন মানব ও মানবীর ভিতর সেতুবন্ধ রচনা করে মিলনের চিরতার মায়া ছড়িয়ে দিযেছিলে, এক তোমরাই পারো এক শয্যা, আবাস ও আহারের সঙ্গী ও সঙ্গিনীকে দুটি স্বতন্ত্র পবনবৃত্তে বিচ্ছিন্ন করে দিতে, বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, তাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করে তাদের জীবনকে মৃত্যুর অধিক করে তুলতে। হে আমাদের, মানব-মানবীর, দেবগণ, তোমরা বাতমণ্ডলী, পবনচক্র ও মরুৎপ্লব রচনা করে, শুধু এমন দুজন নরনারী, যারা একজনের শ্বাসগ্রহণ থেকে আর-একজন শ্বাসত্যাগ দ্বারা, নিজেদের শরীরক্রিয়াকে জীবন্তম রাখতে পারত, ও মানবজীবন যাপন করার পক্ষে শ্বাসগ্রহণত্যাগের সেই যুগ্ম ক্রিয়াই সার্থকতম বিবেচনা করত, শুধু এমন দুজন নরনারীকে, দুজনের সচেতন ইচ্ছায় ও আকাঙক্ষায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন এমন বায়ুমণ্ডলীতে আবদ্ধ করে রাখতে পার ও রেখেছ, মৃত্যুও যা ভাঙতে পারবে না। তারা পরস্পরের অসম্বন্ধ দুই পৃথক মৃত্যুতে অবসিত হবে। তাদের যে-জীবন রৌদ্র ও ছায়ার প্রাণবন্ত দাম্পত্যের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল, তা আলো ও অন্ধকারের বৈপরীত্যের পরিণতি পায়। তাই তাদের কারো মৃত্যুতে কোনো বৈধব্য বা বিপত্নীকতা ঘটে না।

এ তো সেই বিচ্ছেদের কাহিনী, যে-বিচ্ছেদকে তোমরা তেমন ভাবে রক্ষা করেছ, যেমন ভাবে দিগ্‌গজগণ দিকসকলকে রক্ষা করেন। হে আমাদের, মানব-মানবীর, বিস্মরণরক্ষাকারী দেবগণ, তোমরা ছাড়া এ-কাহিনীর শ্রোত্রে আর কে আহুত হতে পারে?

দেবগণ, আমার, মানবের, আমাদের, মানব-মানবীর, আমাদের এই মিলনময় দাম্পত্য থেকে সে-সন্তান জন্ম নিয়েছিল, সেই সন্তান মানবীগর্ভ থেকে বাইরে এসে, তোমাদের, বায়ুর, অনিলের, পবনের, বাতের, মরুতের ও সমীরের স্পর্শে কেঁদে উঠেছিল, তার সেই কান্নার ধ্বনি, তোমরা, হে দেবগণ, পুরাণপ্রসিদ্ধ ত্রিলোকে-তোমরাই ছড়িয়ে দিয়েছিলে ও তোমাদের সেই প্রথম স্পর্শে, সূর্যালোকস্পর্শহীনতার কারণে তার যে-ত্বক রক্তিম, সেই ত্বক,

শিহরিত হয়েছিল। সেই জাতকের হৃৎপিণ্ডকে তোমরা পূর্ণ মানুষের হৃদস্পন্দনের দ্বিগুণ বেগে স্পন্দিত রেখে তার অঙ্গুলিমেয় শরীরটুকুর ভিতরে রক্ত যে-চক্রপথে গতিবান ছিল, সেই চক্রকে অসঙ্কুল রাখতে ও মাতৃস্তন্যপানকালে সেই জাতকের শ্বাসকে তার গলাধঃকরণক্রিয়ার ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে ও এই দুই ক্রিয়ায়, বা এই একই ছন্দিত ক্রিয়ায়, বা তার পীত স্তন্যের তাপে, সেই জাতকের ললাটদেশে ও মাথার খুলিতে যে-স্বেদবিন্দুগুলির উদগম ঘটত, তোমরা, যে-বাতাস গাছের পাতাকেও নাড়ায় না, বাতাসের সেই বকম ধীরতায়, সেই স্বেদবিন্দুগুলি মুছিয়ে দিতে। সেই শিশু যখন হামাগুড়ি দিত, বা দাঁড়াত, বা দু-এক পা মাত্র হাঁটত, হে দেবগণ, তোমরা তখন দেবতাদেরও পক্ষে বিস্ময়কর সেই মানবপ্রগতিতে মুগ্ধ হয়ে তোমাদেরও অজ্ঞাত এই স্বাবলম্বনকে কেমন, অস্থির সমর্থন দিতে চাইতে। সেই শিশুই, হে দেবগণ, তোমাদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে গোষ্ঠে যাবার উপযুক্ত হয়, ঋতুচক্রে প্রবেশের ও লীলার যোগ্য হয়, প্রবাসগমনের ও যৌবন প্রবেশের বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ও শেষে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তক্ষম হয়। হে নভোনেতাগণ, আমাদের মিলনজাত সেই পুত্রকে যেমন আমরা জন্ম ও লালন দিয়েছি, তেমনি তোমরাও সেই জাতকের ত্বককে রৌদ্র, শৈত্য, নীহার ও বর্ষণসহ করে তুলেছ। তার শৈশব ও বাল্যজুড়ে সে-জাতক যতটা আমাদের মানববংশের অন্তর্ভূত ছিল, প্রায় ততটাই তোমাদের দেববংশের অন্তর্গত ছিল, যেমন, সকল মানবশিশুই দেবশিশু। ফলে, সে যখন মুখব্যাদান করে কেঁদে উঠত তখন তার মুখবিবরের ঐ সামান্য ব্যাপ্তিতে বিশ্বরূপ প্রতিবিম্বিত হত ও সে যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় কারণে হেসে উঠত, তখন তার কণ্ঠনিঃসৃত ঐ সামান্য ধ্বনিতে পৃথিবীর পরিমাপের তিন গুণ জলরাশির তরঙ্গ বেজে উঠত। সেই শৈশবে ও বাল্যে শিশু নিজেকেও জানেনা, অথচ, তাকে সবাই জেনে নিতে থাকে। সে-ও সকলের অজ্ঞেয় এক প্রক্রিয়ায় নিজেকে আকাশে, আলোতে, বায়ুতে, জলে, গৃহে ও প্রান্তরে স্থাপন করে যেত। তারপর, কৈশোর তার দেহে সঞ্চারিত হতে-হতেই সে আবার কোন অজ্ঞেয় প্রক্রিয়ায় নিজেকে, কেবল নিজেকে, কেবলই নিজেকে জানার অভিযান শুরু করে দিয়েছিল। আত্মমৃগয়ার সেই ঋতুতে ক্রমেই নিজেকে ও তার পরিপার্শ্বকে জানত, তার পরিপার্শ্ব, যার মধ্যে হে দেবগণ, আমরা, তার মাতাপিতা, আছি, তেমনি, তোমরা,তার রক্ষক ও তার লীলাসহচর দেবগণও, আছ। আত্মমৃগয়ায় সব মানুষই ক্রমে নিশ্চিত সঙ্গীহীন হয়ে পড়ে। প্রকৃত মৃগয়াশীল রাজা, যেমন, নিজের পদরেখা নিজেই মুছতে-মুছতে, গভীর থেকে গভীরতম অরণ্যের

ভিতর প্রবেশ করে ও তার সেই প্রত্যয়ী প্রবেশের সুযোগে, বিবিধ মায়া বিবিধ বধযোগ্য পশুর রূপ ধারণ করে, সেই রাজাকে অরণ্যের নিভৃতির ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ-অক্ষম বৃক্ষরাজির অভ্যন্তরে প্রবেশে উৎসাহ দেয় ও সেই রাজা তখনো সেই সব মায়া-বনচরদের নিজের ধনুর্বাণে নিধনযোগ্য ভেবে রথহীন, অশ্বহীন, অনুচরহীন ধেয়ে যায়, তেমনি, হে দেবগণ এই জাতকের বিশ্বাস অনড় ছিল শুধু লক্ষবেধের ক্ষমতায় ও তার বাণের হত্যাপারগতায়। সেই নিঃসঙ্গতায় ও সেই আত্মবিশ্বাসে, সেই অরণ্যের ও তার সেই অন্তরের অন্ধকারে, সেই বাস্তব পশুপাখি আর সেই রূপান্তরশীল মায়াময় পশুপাখির বনভূমিতে, সেই অনধিগম্য অরণ্যে পথনির্মাণ বা পথ হারানো—কী ঘটেছিল, তা, হে দেবগণ, আমরা কী করে জানব, আর, হায় দেবগণ, তোমরা-ই বা কী করে জানবে, কারণ, মানবের যে-প্রদেশ একান্তই মানবের, সেখানে, হে দেবগণ, তোমাদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ ও তোমরা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের রূপ বদলাতে দক্ষ ও পারগ হলেও ও পুরাণপ্রসিদ্ধ ত্রিলোকের প্রতিটি স্থানাঙ্কে প্রবেশের কৌশল তোমাদের আয়ত্তে থাকলেও, হে দেবগণ, একমাত্র মানবই পারে এমন প্রদেশ নিজের ভিতরে ও বাইরে রচনা করতে যার অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকারের বরিষ্ঠ বিদারক সূর্য তার সহস্র ফলক বিশিষ্ট রশ্মি দিয়েও বিদারণ করতে পারেন না। তাই হে দেবগণ, আমি, মানব, এ-কাহিনীতে শুধু সেই জাতকের জীবনের সেই সামান্য, ও সামান্য পর্বের কথাই বলতে পারব, যে-শৈশবে ও যে-বাল্যে, সে তার পরিপার্শ্বকে জানত না, আর তার পরিপার্শ্ব শুধু তাকেই জানত।

এ তো সেই বাল্যখণ্ডের কথা, যে-বাল্যখণ্ডকে তোমরা তেমন ভাবে সঙ্গ দিয়েছ, যেমন ভাবে, পার্বতী নবজাত গণেশকে আত্মক্রীড়ায় ব্যস্ত রেখে কার্যান্তরে গিয়েছিলেন। হে আমাদের, মানব-মানবীর সন্তানের জন্ম, শৈশব ও বাল্যরক্ষাকারী দেবগণ, তোমরা ছাড়া এ-কাহিনীর শ্রোত্রে আর কে আহুত হতে পারে?

হে আমার, মানবের, ও আমাদের, মানবীর, ভিন্ন অর্থে স্মৃত একই দেবতাগণ, তোমাদের স্মরণের মধ্যেও আমাদের কোনো মিল নেই। কিন্তু আমরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়েও একই ভঙ্গিতে আমাদের শোক প্রকাশ করব। হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর, তোমরা এমনই স্থায়ী ও অনড় ও পরিবর্তনে অক্ষম, তোমাদের বিচরণ ও সক্রিয়তা এতই নির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত, তোমাদের কালাতিপাত, কালাতিপাতের সেই অনতিক্রম্য নিয়ম থেকে তোমাদের ব্যতিক্রম, তোমাদের ক্ষমতা ও তার প্রয়োগ—এ-সবই এমন পুরাণসিদ্ধ যে তোমরা আমাদের, মানবের, মানব-

মানবীর, এই আধুনিক স্বভাবান্তর সম্পর্কে অবহিতও নও যে, আমাদের পারস্পরিক পার্থক্য এতই গভীর ও ব্যাপক হয়ে গেছে, যে, সন্তানের আত্মহননের ফলে আমাদের শোকও আমরা সমবেত স্বরে তৈরি করে তুলতে পারি না। ভঙ্গির কোনো-কোনো মিল হয়তো থাকতে পারে, কারণ, মানুষের অঙ্গের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি ও সেগুলির সংস্থানে তারা কয়েকটি মাত্র ভঙ্গিই বারবার তৈরি করে, বারবার ভেঙে, বারবার পুনর্গঠন করতে পারে। সেই ভঙ্গুরতাময় ভঙ্গিতেই আমরা ভিন্ন অবস্থানে একই শোক উদগারণ করব। হায় দেবতা আমার, মানবের, তোমরা মানুষকে অসংখ্য মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাত্রার নিয়তি দিয়েছ, এমনকী যুদ্ধেও শতপুত্রের মৃত্যুর শোকবহনের ভাগ্য দিয়েছ, এমনকী মহাপ্রস্থানেও প্রাণের অধিক ও বারবার যাদের মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত করতে হয়েছে সেই ভাইদের মৃত্যু পার হয়ে জীবিত জ্যেষ্ঠকে যাত্রায় অব্যাহত গমনে বাধ্য রেখেছ, কিন্তু তার একটি কণ্ঠ থেকে হা হা ধ্বনি প্রকাশের ক্ষমতা দিয়েছ কতই স্বল্প, তার দুইটি চোখ থেকে অশ্রুপাতের ক্ষমতা দিয়েছ কতই পরিমিত। হায়, দেবগণ, তোমরা মানুষকে বজ্রক্ষেপণ তুল্য শোক দিয়েছ, আর শুধু অন্তর্গত গর্জন দিয়েছ। হায়, হায়, দেবগণ, তোমরা মানুষকে গঙ্গাবতরণ তুল্য শোক দিয়েছ, আর শুধু বিন্দুতে পরিমেয় অশ্রু দিয়েছ। হায়, দেবগণ, তোমরা মানুষের ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডকে এমন এক অস্থিপঞ্জরে ঢেকে দিয়েছ, যা সে নিজের দুই মুষ্টির আঘাতে-আঘাতেও ভাঙতে পারে না। হায়, দেবগণ, তোমরা মানুষকে এমন মাটি দিয়েছ যার ওপর বারবার ললাটের আঘাত করেও সে না পারে নিজের মাথা চূর্ণ করতে, না পারে মাটির ওপরের আস্তরণ ভেদ করতে। যদি শোকই দাও, দেবতা আমার, মানবের, তবে তা প্রকাশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দাওনি কেন? অথবা, হে দেবগণ, মানুষের শোক দেবতার শোকের চাইতে দীর্ঘায়ু বলেই, তোমরা মানুষকে কালাঙ্কে স্থাপন করো,যাতে তার শোক কোনো একটি প্রকাশেই সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে না যায়, যাতে তার শোক তার সারা জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে যায় ও যাতে এক-এক প্রকাশের পর তার শোক কিছুটাও কমে না-গিয়ে আবার বিন্দু-বিন্দু ক্ষরণে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ তো সেই জীবনাবধি শোকের কাহিনী, মরণাবধি শোকের কাহিনী। হে আমাদের শোক-অনিবারণের দেবগণ, হে আমাদের একক শোকার্তির সাক্ষী দেবগণ, তোমরা ছাড়া এই কাহিনীর শ্রোত্রে আর কে আহুত হতে পারে।

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরা আমাদের প্রাণ ও যে প্রাণ সে-ই বায়ু, সে-ই অনিল, সে-ই পবন, সে-ই বাত, সে-ই মরুৎ, সে-ই সমীর। তোমরা আমার, মানবের, প্রাণ, অথচ তোমরা

আম্যদের, মানবদের, আর যুত রাখতে পার না। আমরা প্রত্যেকে পৃথক, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকে অনপেক্ষ। বায়ু আর আমাদের যুত রাখে না। কিন্তু বায়ু, অনিল, পবন, বাত, মরুৎ ও সমীরই একমাত্র পারে প্রত্যেককে পৃথক-পৃথক বায়ুচক্রে, পবনচক্রে, বাতচক্রে, মরুৎচক্রে ও সমীরচক্রে আবদ্ধ করে দিতে। হে আমার নভোদেবগণ, তোমরাই একমাত্র পারো কোনো আহ্বানকে কোনো শ্রুতিতে পৌঁছে না দিতে, কোনো উচ্চারণের কোনো প্রতিধ্বনি সৃষ্টি না করতে, কোনো শব্দে তার পরবর্তী শব্দের আকাঙ্ক্ষার জন্ম না দিতে ও কোনো-কোনো শব্দের সমাবেশ থেকে কোনো অর্থ উত্থিত হতে না দিতে।

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমাদের এই শ্রোত্রতে আহ্বান করছি যাতে তোমরা আমাদের প্রত্যেককে তার নিজ-নিজ বায়ুচক্রে আবদ্ধ করে রাখতে পারো, যাতে কাহিনীর সিদ্ধতার কোনো গূঢ় টানে কেউ নিজের বাতচক্র ভেদ করে বেরিয়ে আসতে না পারে, আমাদের কারো সঙ্গে কারো যাতে কোনো সংযোগ তৈরি না হয়, আমাদের উচ্চারিত ধ্বনিগুলি যাতে শব্দ হয়ে উঠতে না পারে, আমাদের উচ্চারিত ধ্বনির কোনো প্রতিধ্বনি যাতে তৈরি না হয় ও আমাদের মিলনের, বিচ্ছেদের, সন্তানের বাল্যখণ্ডের, সন্তানের আত্মহননের, আমাদের শোকের এই কাহিনী যেন কোনো ভাবেই কোনো ধারাবাহিকতায় গ্রথিত না হয়, যেন কোনো ভাবেই কোনো কার্যপরম্পরায় ত্বরান্বিত না হয়, ও যেন কয়েকটি পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন না হয়।

তাই হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরা এই শ্রোত্রে এসে তোমাদের গতিবৃদ্ধি করো, ও দিককে অতিক্রম করার সময় অশ্বিনগণ যে কৃতসঙ্কল্পতায় ও পেশিসামর্থ্যে সম্মুখের বাধা উত্তীর্ণ হতে নিজেদেরই শরীরের ভিতর থেকে সন্ধি ও গতির অতিরেক উৎপাদন করে, তোমরাও তেমনি এই শ্রোত্রে তোমাদের ক্ষমতার অতিরেক প্রয়োগ করো।

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক গতিপথ পরিহার করো, ও তোমাদের যে-শক্তির সাহায্যে তোমরা কখনো বিপরীত গতিপথে, কখনো অপরের গতিবর্ত্মে, প্রবেশ করে সমস্ত নির্দিষ্টতাকে অভবিতব্যতায় পরিণত কর, সেই শক্তিকে সংহত করো ও এই শ্রোত্রে প্রয়োগ করো, যাতে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুতে, বা সেই ঘূর্ণিবায়ুর সমার্থক বাতমন্ডলীতে, বা সেই বাতমন্ডলীর সমার্থক পবনচক্রে, বা সেই পবনচক্রের সমার্থক মরুৎপ্লবে এই কাহিনীর সমস্ত বিন্যাস বিধ্বস্ত, অর্থহীন ও পুনরন্বয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে।

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—এ কাহিনীর সমস্ত কাহিনীত্ব তোমরা ঘূর্ণিবায়ু, বাতমণ্ডলী, পবনচক্র ও মরুৎপ্লব সৃষ্টি করে ধ্বংস করো। এর মিলনের অর্থের আকাঙ্ক্ষায় আয়োজিত ধ্বনিপুঞ্জের মধ্যে বিরহের হাহাকার যেন ঢুকে পড়ে ও এর বাল্যলীলা ও গোষ্ঠের ব্যবস্থাপনায় যেন আত্মহত্যার বিষ ছড়িয়ে পড়ে।

হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরা এতটাই উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠো যে সেই ঘূর্ণির মধ্যে কোনো আলাপনের বিস্তার যেন সম্ভব না হয়, সেই ঘূর্ণির মধ্যে কোনো সংলাপের সম্ভাবনা যেন রোপিত না হয়, এমনকী সেই ঘূর্ণির মধ্যে যেন স্বগতোক্তির একটি গোপন শৃঙ্খলাও তৈরি না হয়। ধ্বনি যেন ধ্বনি হয়ে না ওঠে, শব্দ যেন শব্দ হয়ে না ওঠে, শব্দ থেকে যেন অর্থ তৈরি না হয় ও অর্থগুলি মিলিতভাবে যেন কোনো অন্বয় তৈরি না করে।

তাহলে হে বায়ু, হে অনিল, হে পবন, হে বাত, হে মরুৎ, হে সমীর—তোমরা এই শ্রোত্রে সমবেত হও, আমরা এই শ্রোত্রে সমবেত হই ও আমরা পারস্পরিক নিরপেক্ষতায় এই মিলন-বিচ্ছেদের কাহিনী, এই বাল্য-আত্মহননের কাহিনী, ও এই শোকগাথার ত্রিস্তর সম্পূর্ণতা নিঃশেষে ভেঙে ফেলি, ধ্বংস করি, পুনরুজ্জীবনের বীজহীন করি। সেই ভাঙনের জন্যে, ধ্বংসের জন্যে ও পুনরুজ্জীবন অসম্ভব করে তোলার জন্যে, এই উচ্চারণগুলির প্রয়োজন ছিল, ঘূর্ণি হাওয়ার এই নিরর্থ উচ্চারণগুলি।





মানবলোক

এক

যদি হাওয়া তখন পূর্বগামী থাকত, তাহলে সে এই কথাগুলি তার কাছেই পৌঁছে দিতে পারত। হাওয়া এখন হয় দক্ষিণমুখী। অথবা প্রত্যয়নমুখী।

তোমার-আমার, সম্বন্ধ, কদিনের থাকল? আমি একটু থমকে ছিলাম —তোমার-আমার ভিতরে সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে সমুদ্রস্রোতের মিশে যাওয়ার মত যে-মিলন ঘটে উঠেছিল তা নির্দিষ্ট করার মত কোনো শব্দ নেই? আশ্চর্য! বিবাহ বলতে যদি দুজনের সম্পূর্ণ মিলন বোঝায়, তাহলে, আমরা দম্পতি। কিন্তু বিবাহ মানে তো মন্ত্রও বোঝায়। সেই মন্ত্রই তো অনুমোদন ও অধিকার তৈরি করে। আমাদের বিবাহ ছিল মন্ত্রহীন, অনুমোদনহীন ও অধিকারহীন। আমরা বিবাহতুল্য জীবন যাপন করেছিলাম, বিবাহের কোনো মন্ত্রপাঠের অধিকার না পেয়ে, মন্ত্রের কোনো অনুমোদন না পেয়ে। চণ্ডালের

মন্দিরপ্রবেশের মত আমাদের বিবাহপ্রবেশ। তুমি কি অন্যের অনুমোদিত স্ত্রী ছিলে ? তুমি কি তখনো অনূঢ়া ছিলে ? এ-সব প্রশ্নের কোনো মীমাংসা নেই, কারণ এ-সব কোনো প্রশ্নেরই কোনো ভিত্তি নেই। আমাদের সব শব্দের ভিতর কোনো-না-কোনো সামাজিক অনুমোদন বা নিষেধ লিপ্ত আছে। কোনো নারী কি এমন থাকতে পারে যে অনূঢ়াও নয়, আবার অন্যের অনুমোদিত স্ত্রীও নয়, কিংবা ধরা যাক, বিধবাও নয়। তাহলে তুমি আমার কী ছিলে ? আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে উদ্বেল, গভীর ও অমেয় সময় কাটালাম যে-বন্ধনে, সে-বন্ধনের কোনো নাম নেই ? এই বন্ধনকেই কেন জোর দিতে চাইছি ? আমাদের দুজনের বন্ধন তো ছিল কত অজস্র আজন্ম, বংশানুক্রমিক ও অর্জিত বন্ধন থেকে মুক্তি। এত মুক্তির পথ দিয়ে, বা, এত মুক্তি ঘটাতে-ঘটাতে, যে-বন্ধন তৈরি হয়, সে কি বন্ধন ? আমরা কি তাহলে সেই বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলাম, যে-বন্ধন বাঁধা যায় মানুষের পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায়। সে-বন্ধনের মুক্তিও ঘটে মানুষের পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায়। কোথায় মানুষ নিজেকে এতটাই অধীন করে রাখে, যে, সে তার মুক্তিকেও মুক্তি বলে চিনে নিতে পারে না, এমনকী সেই মুক্তির বন্ধনের কোনো নাম বা পরিচয় পর্যন্ত দিতে পারে না। অথচ, সভ্যতা বলতে তুমি যদি কিছু অনুমান করে নিতে পারো, তাহলে যে-সভ্যতাগুলি আমরা পেরিয়ে এসেছি, ও যে-সভ্যতার আলোড়নের মধ্যে আমরা বসবাস, জীবনযাপন করছি ও এই সভ্যতার পর যে-সব সভ্যতা তৈরি হয়ে উঠবে, সমুদ্রের প্রবালদ্বীপের মত, সেই সব সভ্যতার দিকে তাকিয়ে দেখো, মানুষ শুধু এই একটি বন্ধনের, বা মুক্তির, বা সম্বন্ধের নামকরণ করতে চাইছে এমন একটি শব্দে, যার ভিতরে কোনো আনুগত্য বা সামাজিকতা লুকনো নেই। মানুষ এখনো কোনো ভাষায় তার স্বাধীনতম সেই সম্বন্ধের কোনো পথ খুঁজে পায়নি, যে-সম্বন্ধ একমাত্র মানব ও মানবীই রচনা করতে পারে, যে-সম্বন্ধে মানব ও মানবী উত্তীর্ণ হতে পারে। আমার এমন একটি জিজ্ঞাসা—তোমার-আমার সম্বন্ধ কদিনের থাকল—তৈরি করতে গিয়ে, আমি সেই সম্বন্ধের পরিচয় কী, এই প্রাক-প্রাথমিক জিজ্ঞাসাতেই ঠেকে গেলাম।

দুই

যদি হাওয়া বর্তমান থেকে অতীতের দিকে বইতে পারত, তাহলে কোনো এক ক্ষণে উচ্চারিত তার এই কথাগুলি সাম্প্রতিক পর্যন্ত চলে আসতে পারত।

সমুদ্র যে-সৈকত ভিজিয়ে দিচ্ছে, এই পৃথিবীর চাইতে প্রাচীনতর এই সমুদ্র, সেই সৈকতে পাখিদের কাকলিতে ধ্বনিরণিত কুঞ্জগুলিতে, অথবা ফুলভার সত্ত্বেও পাড় থেকে নদীর জলের ওপর দিয়ে কোনাকুনি খাড়া চাঁপা গাছের নীচে, আমরা যখন দুজন দুজনের শরীরের ভিতর প্রবেশ করতাম, আমার চোখদুটো তাকে দেখত, আমার কানদুটো তাকে শুনত, সেই আসঙ্গে আমার বাহুদুটি পুষ্ট হয়ে উঠত। সেই বাহুদুটি এখন রোগা হয়ে যাচ্ছে। আর দুই মণিবন্ধ থেকে শাঁখা খসে পড়ছে। এমন দুটো বাহু নিয়ে আমি কী করব? লোকে বলে, 'তোমাকে সইতে হবে।' তারা কি জানে, টা—ন কাকে বলে? অথবা, তাদের মনের জোর এতই বেশি যে তারা সেই টানকেও সংযত করতে পারে? আমি যদি তাকে দেখতে না পাই, দুঃখ আমাকে এমনই ডুবিয়ে ফেলে, সমুদ্রের খুব উঁচু ঢেউয়ের মাথার ফেনাগুলি যেমন বেলাভূমির পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে কণায় কণায় জলের সঙ্গে চিহ্নহীন মিশে যায়, তাহলে আমি সইবটা কী?

তিন

হাওয়া যদি এখন পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পেরিয়ে কোনাকুনি, স্থলভূমির ওপর দিয়ে, বঙ্গোপসাগরের দিকে বইত, তা হলে, সে এই কথাগুলি তাকেই বলতে পারত। হাওয়া এখন সমুদ্রবদল করছে।

আমি এখন সংজ্ঞা তৈরি করতে যাব না, সংজ্ঞা শুনতেও যাব না। এ যেন পিণ্ডদান করতে গিয়ে প্রেতের নাম ভুলে যাওয়া। আমাকে অনেক শ্রাদ্ধ করতে হয়েছে। আর এমন সংজ্ঞাবিভ্রাট এক আমারই নিশ্চয়ই ঘটে না। ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের নাম দরকার হয়, নইলে প্রেতকে তো একটা পরম্পরায় স্থাপন করা যাবে না। নাম ভুলে গেলে পুরোহিতরা বলে দেন, 'যথা নামঃ'। আমি তো আমাদের সম্বন্ধের প্রেতনাম জানতে চাইছি। একটা ধাঁধা শুনিয়েছিলেন এক বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক—'আবোল তাবোল'-এ আদ্যিনাথের মেশোর সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়িয়েছিল? বা, আমি আর-একটু আধুনিকতায় বাচাল হতে পারি, একটু তুচ্ছতা দেখাতেও পারি সম্বন্ধের প্রত্নে বাঁধা আমি কোনো আজব জীব নই, আমিও জানি সব সম্বন্ধই ভঙ্গুর ও ভঙ্গুরতাই সব সম্পর্কের ভবিতব্য। এই এক হিন্দি সিনেমার নাম ভারতের লোকসভাতেও উঠেছিল, 'আপ হামকো হ্যায় কৌন?' বা, 'হাম আপকো হ্যায় কৌন?' আমাদের সময় সিনেমার এই নামটা ছিল না, কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তো

ছিল, আমাদের জীবনযাপনের সেই উচ্ছলতায় ও প্রাবল্যে, 'তুমি আমার কে ?' বা, 'আমি তোমার কে ?' আমরা যে কেউ কারো কিছু নই, সেই আনন্দ, আমরা বারবার আস্বাদ করতে চাইতাম, মুক্তির আনন্দ, আনন্দ মুক্তির। আমরা জানতাম, এ-প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে শুধু কবিতায় ও পৃথিবীর যে-সব লিপি আমাদের দুষ্পাঠ্য ও দুর্বোধ্য আর যে-সব ভাষার ধ্বনি আমাদের দুরুচ্চার্য ও দুরশ্রুতি, সেই সব লিপিতে ও ধ্বনিতে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে ও তার কত কত কত উত্তর দেয়া হয়েছে। এই একটি প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর সমস্ত ভাষায়, সমস্ত মানুষের বোধগম্য। 'ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান', আমি তোমার সেই পথ, নারী। 'স্রোতবিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি', আমি তোমার সেই স্রোত, নারী। সে-পথের কোনো গন্তব্য নেই, সে-স্রোতের কোনো মোহানা নেই। 'তুমি তো চির হে ওগো, তুমি তো চির হে', হায়, এই একই দিনরাত, তারামণ্ডলী ও সমুদ্রবেষ্টিত এই একই পৃথিবীতে এই একই বাতাসে এই একই কথাগুলি দিয়ে দুজন মানুষ কথা বলেছিল। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো ভাষা জানা ছিল না। আর তার চাইতেও বিস্ময়ের এই ঘটনা যে এই কথাগুলি একবার, মাত্র একবার, উচ্চারিত হওয়ার পরও পৃথিবী অপরিবর্তিতই আছে।

চার

বাতাস যদি খনন করতে পারত, তাহলে, কত স্তর মাটির নীচ থেকে এই কলসগুলি উঠে আসত, যার মুখ সহস্র-সহস্র অব্দের জন্যে বন্ধ ও সে-মুখ, কলসকে অভগ্ন রেখে, খুলতে পারলে, এই কথাগুলি বাতাসে উড়ে আসত, আর, কলস ভেঙে গেলে, এই কথাগুলি হারিয়ে যেত।

আমি কোথাও আমার পুরুষকে এখন খুঁজে পাচ্ছি না, এই উৎসবে, যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকরা যেখানে বিস্মৃত সব অভ্যাসে ফিরে আসছে, তাদের মধ্যে, যে-সমস্ত মেয়েরা যুগল বেঁধে নাচছে, তাদের মধ্যে। আমি তো এক নর্তকী। আমার পুরুষ তো আমার গৌরব, তাকে খুঁজে না পেয়ে নাচের মুদ্রাসুপ্ত আমার এই হাতের সব শঙ্খমালা খসে-খসে পড়ছে। আমার সেই পুরুষও তো এক নর্তক।

পাঁচ

জলশোষণ না করে বাতাস যদি সমুদ্র পেরতে পারত, তাহলে এই কথাগুলি দিয়ে সমুদ্রান্তরের সেই বাতাসকে ফিরিয়ে আনা যেত।

তোমার-আমার সম্বন্ধ কদিনের? খুব লম্বা করে যদি ভাবো, তাহলেও তো এক জন্মের বেশি হতে পারে না। তাও আবার দুজনের আয়ুষ্কাল-মেলানো এক জন্ম নয়, দুজনের দুই জীবন ধরা এক জন্ম। আমরা দুজন তো সহোদর-সহোদরা নই। শুধু এই এক অনুতাপে আমাদের কত আয়োজন কতবার ব্যর্থ হয়ে গেছে। যেন তখন আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমাদের মিলন অনন্ত। আর যতই সেই অনন্তে নিশ্চিত ছিলাম, ততই আমরা এই অনুতাপে কাতর ও উদাসীন হয়ে উঠতাম যে, কেন, কেন, কেন আমাদের জীবনের, বা প্রাকজীবনেরও এমন কোনো সময় ছিল, যখন আমরা পরস্পরের সংলগ্ন ছিলাম না, যখন আমাদের একজনের জীবন আর-একজনের জীবনেরই ওপর সম্পূর্ণত নির্ভরশীল ছিল না। কেন আমরা সহোদর-সহোদরা নই। কেন আমরা যমজ নই। সহোদর-সহোদরার সঙ্গম শুধু নিষিদ্ধ নয়, পাপ। কিন্তু আমরা তো সহোদর-সহোদরা হিশেবে জন্মাইনি। আমাদের গর্ভবাসের পৃথক উদর ছিল। আমরা দুজন দুজনে এতই সম্পূর্ণ ছিলাম যে আমরা আমাদের জীবনেতিহাসের কোথাও কোনো ফাঁক মেনে নিতে পারছিলাম না। তুমি গর্ভেও সহবাস চাইছিলে।

যমী তার সহোদর ভাই যমকে বলেছিল, এক গর্ভে আমরা ছিলাম, যম ও আমি। সেই অধিকারেই যমকে আমি সম্ভোগ করব। এই সমুদ্রের প্রসারিত প্রদেশ সে-সম্ভোগের অনুকূলতা করবে। তারপর পিতার পৌত্রকে যম আমার গর্ভে উৎপাদন করবে। সেই যম শুধু যমলোকেই দীপ্যমান নয়, সেই যম এই ভূলোকেও উজ্জ্বল।

যম নিষেধ করেছিল, হয় না, হয় না, সহজাতা কখনো ভার্যা হয় না।

যমী সে-নিষেধ মানতে চাননি, হে যম, তোমার মন আমাতে স্থাপন করো, আমাদের মন এক হোক, তারপর পুত্রের জনক তুমি আমার পতি হয়ে আমার তনুতে প্রবেশ করো।

যমীকে যম নিবৃত্ত করতে বলেছিল, যেহেতু আমাদের মাতাপিতা এক, তোমার অভীষ্ট কার্য আমি করতে পারি না।

যমী যমকে যুক্তিতেও পরাস্ত করতে চাইছিল, পিতামাতা গর্ভেই আমাদের দম্পতিরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের সঙ্গম কে দেখবে, কে জানবে, কে-ই-বা অপরকে বলবে। সূর্য তো দিনে আকাশে থাকে, বরুণ থাকে রাতে, এর মধ্যে কোনো এক অদৃশ্য সময় কি নেই যা শুধু আমাদের সঙ্গমের জন্যেই সূর্যাবর্তে তৈরি হয়ে আছে? জায়া যেমন পতির জন্যে দেহবিস্তার করে, আমি যমের জন্যে যে-রকমই এই শরীর মেলে ধরেছি। রথচক্র যেমন অক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়, আমাদেরও সে-রকম মিলন হোক। মিলন হোক। মিলন হোক।

তুমি যম ও যমীর এই সংলাপকে উল্টে দিয়েছিলে। সহগামিনী, তুমি বর্তমান থেকে যুগযাত্রায় কোনো একটিমাত্র গর্ভে প্রবেশ চেয়েছিলে।

ছয়

সমুদ্রের মন্থন থেকে যদি কোনো কথা উঠে আসত...

মুহূর্তকাল আগে যে-তারাটি ছিল, সেটিকে ও আমাকে প্রায় আক্রমণের ভঙ্গিতেই যে-মেঘ ঢেকে দিল, সেই মেঘের ভিতর থেকে, বা সেই মেঘ ও আমাকে দিযেই, ঈশ্বর, একটা কোনো নারী প্রাণী তৈবি করে তুলবেন। এই-যে সানুদেশগুলিতে এখন রাত্রি নামল ও রাত্রির বাতাস সানুদেশগুলিকে ও আমাকেও আবৃত করে বয়ে গেল, সেই রাত্রি ও বাতাস ও আমাকে দিয়ে, ঈশ্বর, একটা কোনো নারী প্রাণী তৈরি করে তুলবেন। এই যে নদী এই মুহূর্তে ছিন্নভাব ভিতব থেকে বেরিয়ে পড়া এক টুকবো আকাশের দীপ্যমানতা ও আমাকে প্রতিবিম্বিত করে নিল, সেই ছিন্নতা, দীপ্যমান্যতা ও আমার প্রতিবিম্ব দিয়ে, ঈশ্বর, এক নাবী শরীব তৈরি করে তুলবেন। সেই বস্তু বা প্রাণী আর গোষ্ঠে ফেরা এই প্রাণীগুলি এই অনন্ত কাল বিশ্বের নাস্তিকে শ্বাসত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে মেনে নেবে, স্বীকার করে নেবে। আমাকে ও এই অন্ধকারের গৃহদীপগুলি ও সব অপরিচিতদের নিয়ে, কারণ এদের কাউকেই তো আমি চিনি না, আর আমাকে ও আমাকেই নিয়ে, ঈশ্বর, একটি, মাত্র একটি, নারী নির্মাণ করে তুলবেন। যারা এখন ঘুমিয়ে, বৃদ্ধ-আবাসে ঘুমুতে ঘুমুতে যে-বুড়ো কেশে উঠে নিজেই একটু জানান দেয় সে বেঁচে আছে, স্তনে ঠোঁট দিয়ে যে-শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে, অজানা-অচেনার কত ভাঁজ খুলে-খুলে, এদের সবাইকে নিয়ে ও সব সময়ই আমাকে নিয়ে, আমি ব্যতিরিক্ত আর-কিছু না নিয়ে ও আমি যা কিছু জানি না সব নিয়ে, ঈশ্বর, সেই এক বস্তু নির্মাণ করবেন। ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর, নিখিল আকাশে ধূমকেতুর মত সে-বস্তুর সমস্ত গতি শুধু অভিকর্ষে সংহত, কক্ষপথে নিজেকে স্থাপিত করা ছাড়া তার অন্য-কোনো ওজন নেই।

সাত

সূর্যশোষিত জল যদি আকাশে মেঘের আশ্রয় না পেয়ে আবার সমুদ্রেই ফিরে যেতে বাধ্য হত, তাহলে, তাদের আকার হয়তো এই কথাগুলির মত হত।

জীবনের কোনো একটি মুহূর্তকেও সহগমনের বাইরে না রাখতে তুমি

আমাদের সহোদরবাস পর্যন্ত চেয়েছিলে, যমীর মত সহোদরা হয়েও তুমি সহগমন চাওনি। যমীর কথাগুলিকে তুমি উল্টে দিয়েছিলে। তোমার পক্ষে কি আমাদের মিলন চরম মুহূর্তেও সময়কে অতিক্রম করে যেতে পারছিল না? তোমার, বা তোমার-আমার, প্রাক্তন কি কোথাও অনতিক্রম্য হয়ে উঠছিল। তুমি কি আমাদের মিলনকে সেই প্রাক্তনেরও ওপারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে? আমাদের মিলনে তুমিই সেই অশ্ব, না, তুমিই সেই আরূঢ়, এই বিন্যাসকে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল করে দিয়ে তুমি শুধু চেয়েছিলে অশ্ব ও আরূঢ় এই দুইয়ে মিলে গতির যে অদ্বয়, তা এই জন্মের সীমা পার হয়ে যাক। পার হয়ে যাক। সেই কি ছিল, তোমার শেষ হার্ডল, বা, সেখান থেকেই কি শুরু হয়ে গিয়েছিল হার্ডলের ক্রম-অপস্রিয়মাণ, অথচ ক্রমেই দৃশ্যমান, হার্ডলের সারি? তুমি সহোদরকে সহগমনে ডাকোনি, তুমি সহগতকে সহোদরে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। আমাদের জন্মের পৃথক উদরকে যদি তুমি অস্বীকার করতে চেয়েছিলে, তাহলে, আমাদের মৃত্যুর পৃথক চিতাকে তুমি অস্বীকার করতে চাও নি কেন? চাইলে না কেন? নাকি তখনো আমাদের মিলনে চিতাগ্নির লেলিহান অন্ধকারের ঝাপট লাগেনি?

আট

কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশৃঙ্গ থেকে কোনো প্রতিধ্বনি যদি নেমে আসতে পারত হিমবাহের ব্যাপ্তি ও সংহত বেগ নিয়ে, তাহলে এ কথাগুলো সমতল পর্যন্তও হয়তো নেমে আসতে পারত পলিমাটি হয়ে।

এমনও এক সময় ছিল যখন পাহাড়ে পেঁচা ডেকে উঠলে, বা আমাদের বাইরের উঠোনে কোনো হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে নেমে এলে, কাঁঠাল গাছের তলায়, ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যেত। আর, এখন এই ঘুটঘুটে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের যে-ঢাল বেয়ে সে নেমে আসবে, সেই ঢাল বেয়ে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় অস্থির হয়ে ওঠানামা করতে কিছুতেই কেন আমার কোনো ভয় আসে না? বনে-বনে আজি এ কী কানাকানি, কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আঁচলে, 'সে আসিবে' আমার মন বলে।

নয়

বজ্রগর্ভ মেঘের চিহ্নগুলি এই কথাগুলির বাইরে ফুটে উঠতে পারত...

তুমি কী দিয়ে মাপতে আমাদের সম্বন্ধের বয়স? সূর্যের উদয় ও অস্ত

দিয়ে? তাতে তো প্রতিটি দিনকে আলাদা করে গুনতে হয়। তুমি কি তাতে সম্মত হতে পারতে—আমাদের একটা দিনকে আর-একটা দিন থেকে আলাদা করতে? তোমার কাছে তো আমাদের পুরোটা জীবনের সময় ছিল এমন, যাকে খণ্ড করা যায় না, যাকে ছিন্ন করা যায় না, যাকে গণনা করা যায় না। তাহলে, কী দিয়ে মাপতে আমাদের সম্বন্ধের বয়স? চাঁদের উদয় ও অস্ত দিয়ে? তুমি কি তাতেও সম্মত হতে পারতে—আমাদের রাত্রিগুলির অনিশ্চিত প্রহরে-প্রহরে চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত ঘটত। তোমার কাছে তো আমাদের পুরোটা জীবনের সময় ছিল এমন যাকে খণ্ডে-খণ্ডে পূর্ণ ও খণ্ডে-খণ্ডে শূন্য করা যায় না। তাহলে কী দিয়ে মাপতে আমাদের সম্বন্ধের বয়স? কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে, অথবা, শুক্লপক্ষের রাত্রির ধ্রুবতারা দিয়ে? গণনার অতীত সেই রাত্রি আর গণনার উদ্দেশ্য সেই স্থিরতায় কি আমাদের সম্বন্ধকে তুমি আঁটিয়ে নিতে পারতে? হয়তো পারতে—এই নক্ষত্রমালাতেই তো ছিল অপরিশেষ বিচিত্র আর অনবশেষ স্থিরতা। কিংবা হয়তো পাবতে না—নক্ষত্রমালার ঐ ব্যাপকতায় ঐক্য নেই বা ধ্রুবতারার সংহতিতে সেই বিচিত্র নেই। কিন্তু সত্যি করেই তো আমাদের সম্বন্ধের বয়স এক জন্মের বেশি হতে পারে না, তাও দুজনের জীবন মেলানো এক জন্ম নয়, দুজনের দুই আলাদা জীবনের এক জন্ম। আমাদের দুজনের দুজনের কাছে পৌঁছুতে কতগুলো বছর শৈশব খেয়েছে, কতগুলো বছর বাল্য খেয়েছে, কৈশোবেরও প্রথম দিকের বছরগুলি নিজেদের দেখতে নিজেরা খেয়েছি। তারপর তো কত কোটি আলোকবর্ষ পেরিয়ে নবজাতক নক্ষত্রের আলো চোখে এসে লাগল। তখন থেকে যদি জন্মের হিশেব নাও, তাহলে দেখবে কটি বছর, মাত্র কটি বছর আমাদের সম্বন্ধের আয়ু। সেটা কি হিশেবে আসে? আব সেই কটি মানববর্ষের হিশেব কষতেই কি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে পরিমাপের একক হিশেবে বাছছিলে? তোমার অনন্ত, ক-বছরের অনন্ত?

দশ

পাখির ডানায় বাতাসের ইশারা আসে, যদি পাখি ডানায় বাতাস নেয়। পাখির ডানায় বাতাসের ইশারা আসে, যদি পাখি আকাশে ভাসে। তাহলে এই ইশারাগুলি ফুটে উঠতে দেখা যেত, বাতাসের মুখে, যদি বাতাস আকাশে বইত, সেই সময়, যখন এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল।

সেদিন আকাশও ছিল মেঘলা। আমার কেশরাশি সেই দিন বা প্রহর জুড়ে

ধূসর উড়ছিল। জল প্রতিবিম্ব ধরে, এই অলঙ্ঘ্য নিয়মে সমুদ্র মেঘলা হয়ে উঠেছিল। সমুদ্রের ভিতর থেকে বাতাস ফুঁড়ে বেরতে চায় আকাশে—এই যুগান্ত, বা কালান্ত, বা সৃষ্টির আদিরও আদি থেকে চলে আসা নিয়মে, সমুদ্রের মেঘলা জলরাশি ঢেউয়ের চুড়ো তুলছিল আকাশের দিকে, মেঘলা জলের চুড়ো মেঘলা আকাশের দিকে। তারপর যখন সেই চুড়ো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে ফিরে যাচ্ছিল আবারও জলেই, তখন মেঘলা আকাশের নীচে মেঘলা তরঙ্গশীর্ষের সেই শাদা চূর্ণ, মর্মরের মত শাদা, পাহাড় থেকে খুবলে তোলা মর্মরখণ্ডের মত শাদা ও কীর্ণ, দেখাচ্ছিল। আকাশ মেঘলা না হলে, সমুদ্রে মেঘবর্ণ জল ঢেউ তোলে না, আর সে-ঢেউ ভেঙে গেলে, শ্বেতপ্রস্তর এত শ্বেত ও এত কঠিন দেখায় না। এ বাতাসে ইয়োরোপীয় বসন্তের স্মৃতি জাগে, যে-বসন্ত ইয়োরোপের কোনো সমুদ্রে কখনো হঠাৎ শীতের ভিতরেই ঢুকে পড়ে, আবার কোন পথে বেরিয়ে যায়। হায়, মানুষ কী করে মারা যায়, তা যেন কোনো মানুষ জানে না। তেমন কোনো কথা যখনই উঠে পড়ে, মেঘলা সমুদ্রের সৈকতে ধূসরতার দিকে তাকাতে-তাকাতে, কিংবা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে, তখনই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, কিংবা তেরশ পঞ্চাশ, কিংবা ছেচল্লিশের দাঙ্গা বা সত্তর দশকের কথা এসে যায়। মৃতের সেই যোগফলে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক মৃত্যুগুলি, বা, আমাদের প্রত্যেকের দেখা পৃথক মৃত্যুগুলি, হারিয়ে যায়। বা, হারিয়ে না গিয়ে চিরকালের জন্যে স্থির একটি সংখ্যায় নথিভুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ আমাদের প্রত্যেকেই তো তার নিজের মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়, সারা জীবন। প্রত্যেকটি জন্ম একই রকম। প্রত্যেকটি মৃত্যু, অন্য মৃত্যু থেকে আলাদা।

এগার

কোথাও কি কোনো নৌকোর পাল দেখা যায়, আকাশে কিংবা জলে কিংবা মাটিতে, শুধু বাতাসের নিশানায় স্ফুরিত হয়ে ওঠার মত কোনো নৌকোর পাল, তাহলে সেই দিকে এই কথাগুলিকে উড়িয়ে দেয়া যেত, বা ভাসিয়ে দেয়া যেত, বা গড়িয়ে দেয়া যেত।

তোমার মিলন, বা আমাদের মিলনকে, তুমি এমনই ছিদ্রশূন্য সম্পূর্ণ করতে চাইতে, যেন, সে-মিলন, দাক্ষিণাত্যের বা রাজস্থানের কোনো দুর্গ, যেখানে ইতিহাসের কয়েকটি বছর ধরে কেবলই আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণ ঘটতে থাকত আর যেখানে দুর্গকে এমনই দুর্ভেদ্য করে তোলা হত, যে, যে

সেই দুর্গের ভিতরের মানুষ নয়, সে সেই দুর্গে কোনো ভাবেই ঢুকতে পারবে না। কোনোভাবে ঢুকতে পারলে দ্বিতীয় দ্বার পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। দ্বিতীয় দ্বারও যদি সে একা বা কোনো সৈন্যদলের সঙ্গে পেরয়, তাহলে তৃতীয় দ্বার যেন সে খুঁজে না পায়। তৃতীয় দ্বারও যদি সে খুঁজে পেয়ে যায় আক্রমণ নীতির কোনো নতুন প্রয়োগে, কিংবা তার নিজেরই গুপ্ত সব পদক্ষেপে, তাহলেও যেন সে দুর্গের অন্তঃপুর চিনে নিতে না পারে। এমনকী দুর্গশীর্ষে যদি শত্রুপক্ষের পতাকা উড্ডীন হয়, বা, কোনো এক আত্মগোপনকারী ছদ্মবেশ বদলাতে-বদলাতে যদি দুর্গের শিখর জয় করতেও পারে, তাহলেও, দুর্গের গড়ন এমনই, সে দুর্গের অভ্যন্তর খুঁজে পাবে না। কারণ, দুর্গের গড়ন এমনই যে অন্তঃপুর চিনে নেবার বহু বহু আগেই অন্তঃপুরিকারা তাদের প্রতিদিনের চেনা, তাদের প্রতিদিনের চলাফেরার পথচিহ্ন, তাদের প্রতিদিনের গা-হেলানোর দেয়াল, তাদের প্রতিদিনের ছোঁয়াছুঁয়ির খেলার বর্তুল, তাদের প্রতিদিনের পরনের শাড়ির রঙ ছোঁয়ানো নির্মাণ—তার সত্য পরিচয় নিয়ে জেগে উঠত। শত্রু বা কোনো মানুষ যদি অন্তঃপুর চিনে নিতে অন্তঃপুরের দরজা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তাহলে, ঐ মৃত্যুকূপের অতল গহ্বরে সারি-সারি ঝাঁপ দিয়ে অন্তঃপুরের প্রতিদিন, তার অজস্র রঙের ওড়না ওড়াতে-ওড়াতে, মানুষের সমস্ত ভঙ্গি বদলাতে-বদলাতে, অদৃশ্য হয়ে যেত। যেন, মৃত্যুই ছিল সেই অন্তঃপুরেরও অন্তঃপুর।

বার

মানুষ তার দুই ঠোঁট সঙ্কুচিত করে শিখা নেবাবার জন্যে বায়ুর ফুৎকার দেয়, এই কথাগুলি সেই শিখাটি, অথবা সেই ফুৎকারটুকু।

তুমি কি সত্যি-সত্যি তাকে, আমার পুরুষকে, আসতে দেখেছিলে? আর, তার সেই চলন দেখে তোমার মনে হয়েছিল, সে আমারই দিকে আসছে? মানে, দূত, সে তখন এত দূরেই ছিল যে তার চলন দেখে তোমার মনে হল, সে এক দিকের দিকেই আসছে? আর তোমার মনে হল, সে-দিকটা আমিই? কী দেখে তোমার তেমন মনে হল, দূত? সে যে-দিকের দিকে চলছিল সেই দিকটা দেখে মনে হল, আমিই সে-ই দিক, আর সে যখন সেই দিকেই হাঁটছে, তখন আমার দিকেই হাঁটছে! নাকী, তার চলন দেখে মনে হল, ঐ চলনের শেষে আমি না-থাকলে, তার চলন অমন হতেই পারত না? তোমার বুঝি এমন অনেক দিক ও ফিরে আসা দেখার অভ্যেস আছে, দূত? কেমন হয় সে ফিরে আসা? শাদা হাতির ওপরে? আর সেই শাদা হাতিগুলি,

অনেকটা পথশ্রমের ক্লান্তি, ও সামনে আরো অনেকটা পথ অতিবাহনের শক্তি, দূর ও সঞ্চয় করতে, পথে যে-শহর পড়েছিল, সেই শহরের পাশে যে ঢালু পাড়ে নদী ছিল, আসলে, সেই নদীটা ছিল বলেই শহরটা তার পাড়ে তৈরি হয়ে উঠেছিল, আর মানুষজন জলে ওঠানামা করতে-করতে পাড়টাকে এমন সহনশীল ঢালু করে নিয়েছিল, যে-ঢাল বেয়ে জলোত্থিত মানুষের শরীরে লেগে থাকা জল বিন্দু-বিন্দু পড়ে জলে ফিরে যায় কিন্তু জলে নামতে আসা মানুষজনের পা হড়কে যায় না, সেই ঢাল একটুও না ভেঙে, সেই ঢাল বেয়ে সেই নদীতে নিজেদের পাথরের মত শরীরগুলিকে পাথরের মত ডুবিয়ে দিয়ে শুধু পিঠটুকু আর শুঁড়টুকু জাগিয়ে রেখেছিল, আর খুব অবসর ছড়িয়ে-ছড়িয়ে শুঁড় দিয়ে জল শুষে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে একটা রামধনুকে নদীর জলে টেনে নামাচ্ছিল? কিন্তু এ তো আমি আমার পুরুষের আগমনের পুরাণে বলা চিহ্নগুলি তোমার ওপর চাপাচ্ছি। তুমি তোমায় নিজের ভাষাতেই বলো, তুমি নিজে দেখেই চিনতে পারলে সে আমারই পুরুষ, নাকী কেউ তোমাকে বলে দিল, চিনিয়ে দিল?

তের

বাঁশের ঝাড়ে ঢুকলে বাতাস পথ হারিয়ে ফেলে। তখন সে বাঁশের গুচ্ছমূল থেকে বাঁশের পাতা বেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। বাঁশপাতার ভিতর দিয়ে তখন ছোট নদীর সেই কল্লোল শোনা যায়, যা দিনের বেলার অনেক আওয়াজের সঙ্গে মিশে থাকে। তাকে আলাদা করা যায় না। এই কথাগুলি বাঁশপাতায় বহতা নদীর মত এখন কলধ্বনিতে স্পষ্ট।

যে-একক দিয়েই মাপো-না কেন, তুমি তো আমাদের সম্বন্ধকে এক জন্মের বেশি টেনে নিয়ে যেতে পারবে না? তাও সে-জন্মের কতটাই তো আমাদের বাধ্যত আলাদা কেটেছে। তাহলে, মাত্র এক জন্ম? একটাই মাত্র জন্ম? আর তা এতই ছোট, এতটাই ছোট? এরই ভিতর আমাদের জন্ম-জন্মান্তর জড়ানো মিলন ঘটে গেল, ঘটে শেষ হয়ে গেল? এরই ভিতর আমাদের জন্ম-জন্মান্তর দিয়েও ঘোচানো যাবে না, এমন বিচ্ছেদ ঘটে গেল? আর, আমরা দুজন এই এক জন্মব্যাপী সময় ধরে, ধীরে-ধীরে, ধীরে-ধীরে, যেমন ধীরে-ধীরে মরুভূমির বায়ুহীনতায় সারা রাত বালিয়াড়ির বালি ঝুরঝুর ঝুরঝুর ঝরে যেতে থাকে, অথবা, আর-এক জায়গায় পুঞ্জিত হতে থাকে, তেমনি ধীরে-ধীরে, ধীরে-ধীরে জেনে গেলাম, জেনে গেলাম, যে, আমাদের ভিতরে যে-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, তা যুগ-যুগান্ত কেটে গেলেও আর ভরাট হবে

না। নারী, অর্ধনরেশ্বরী থেকে তুমি বদলে যাও সম্পূর্ণ নারীতে, আর আমি অর্ধনারীশ্বর থেকে বদলে যাই সম্পূর্ণ পুরুষে। কী কঠিন শূন্যতা সেই সম্পূর্ণতার। কী কঠিন! আমাদের অভিকর্ষের বদল ঘটে গেছে, আমাদের কক্ষপথের বদল ঘটে গেছে, আমাদের আকাশের বদল ঘটে গেছে। আকাশ একবার বদলে গেলে কি আর তার পুনরুদ্ধার ঘটানো যায় ? যায় হয়তো! বা পৃথিবীতে একজনই পেরেছিলেন হয়তো! তিনি মর্তের আকাশ হারিয়ে, বাড়বাগ্নির, পুরগাতারিওর, ও স্বর্গের আকাশ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু দান্তের তো ছিল এক বিরহ থেকে বিরহমোচনের দিকে যাত্রা, এক বিচ্ছেদ থেকে মিলনের দিকে অভিযান। দান্তের তো কোনো মর্ত ছিল না। আমরা যে মিলন থেকে বিচ্ছেদের দিকে চলে গিয়েছি। মিলন তো একবারই, বা এক পর্বেই ঘটবে, হয় বিচ্ছেদের আগে, অথবা বিচ্ছেদের পরে। মিলনের কোনো পুনরাবর্তন নেই। তাহলে আমাদের জন্ম কতটুকু, যে সেই একটা জন্মেই আকাশ বদলে যায়, কক্ষপথ বদলে যায় ?

চোদ্দ

ধ্বংস্তূপের ভিতর হাওয়া তার প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ চিনে নেয়। এই কথাগুলি সেই বাতাসে ধ্বংসস্তূপের ভিতরে ঢুকে, বাতাস থেকে ঝরে যায়।

আরো একবার, আরো অসংখ্য বারের মত আরো একবার, এই শহরের ঠেলাঠেলি, ঘেষাঘেঁষি, গুঁতোগুঁতি, হুড়োহুড়ি, আওয়াজের অগণ্য গ্রন্থন, ট্র্যাফিকের ঢেউভাঙা ঢেউ, আমাকেই ঘিরে ধরেছে, আমারই ভিতর ঢুকে পড়েছে, আমারই মাথার ভিতর পাক দিয়ে-দিয়ে ঘুরছে, যেন একটা চৌমাথার ট্র্যাফিক আয়ল্যাণ্ডের নাভি থেকে বেরনো চারটি, বা পাঁচটি, বা সাতটি রাস্তার সব গুলিতেই নো-এনট্রির বোর্ড খাড়া করা, আর আমাকে এমন একটি যানের ভিতর বসে থাকতে হচ্ছে যেটা কোনো রাস্তায় ঢুকবার পথ না পেয়ে ট্র্যাফিক আয়ল্যান্ডটাকেই পাক দিয়ে যাচ্ছে, সেই বেদি ও ছত্রসহ ট্র্যাফিক আয়ল্যান্ডটাকেই, সেই বেদির ও ছত্রের বর্তুলতায় বিশ্বজনীন কোনো পানীয় বা গ্রহান্তরে কথা বলা যায়, এমন কোনো সেলুলার ফোনের নাম লেখা। আমার আট-নয় দিকে এই শহরের, যার শরীরের ভিতরে প্রবেশ ও সেই শরীরের ভিতর থেকে নিষ্ক্রমণের পথ আমাকে প্রতিদিন খুঁড়ে-খুঁড়ে তৈরি করে নিতে হয়, সেই শহরের, আলো ও বাড়িগুলি অসমতল উচ্চাবচতায় ছড়িয়ে রয়েছে ও তারা আমাকে ঘিরে ঘুরছে না ও আমি কেবলই তাদের ভিতর দিয়ে ঘুরছি। এমন ঘূর্ণিতে কি আমার মত মেয়েকে, বা হয়তো পুরুষকেও, প্রতিদিনই

পড়তে হয় আর আমাকে সেই ঘূর্ণির ভিতর থেকে প্রতিদিনই কি জানতে হয় যে আমি কোনোদিন, কখনোই, এই শহরের শরীরের ভিতরে ঢুকবার ও সেখান থেকে বেরতে পারার সুড়ঙ্গ খুঁড়িনি, খুঁড়িনা, আমি শুধু এই শহরের শরীরের এক অভ্যন্তর থেকে ভিন্নতর অভ্যন্তরে পরিবাহিত হই? ঘূর্ণির সেই মধ্যবিন্দু থেকে যে-দু-তিনটি সেতুর চার-ছয়টি স্তম্ভকে ধূসর আকাশ ভেদ করে জেগে উঠতে দেখি, বা হয়তো সেই স্তম্ভগুলির দ্বারা সংগঠিত সেতুর নীচে জলস্তর পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজগুলির সহজ ভাসমানতাযোগ্য শূন্যতা সেই চার-ছয়টি স্তম্ভের মাথার ওপরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, দেখি, যে, আমার আর বোঝার কোনো উপায় থাকে না, স্তম্ভগুলি আকাশে প্রোথিত নাকি মাটির ভিতরের মাটিতে, অথবা আকাশকে বিদ্ধ করছে, নাকী মাটিকে।

পনের

পৃথিবীর একটি প্রধান সমুদ্র থেকে উত্থিত বাতাসের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা পৃথিবীর এক প্রধান নগরের অজস্র দেয়াল আর দেয়ালে যদি এই কথাগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে না যেত, তাহলে, এই কথাগুলি হয়তো আর-এক সমুদ্রবায়ুর সঙ্গে মিশে আরো দূরবর্তী হয়ে উঠতে পারত।

শুধু তোমার-আমার সম্বন্ধের পক্ষেই, নাকী মানুষের যে-কোনো সম্বন্ধের পক্ষেই এই একটা জন্ম যথেষ্ট নয়, এই একটা জন্মব্যাপী সময় যথেষ্ট নয়। কখনো-কখনো তো মনে হতেই পারে, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু সময়টি বড় বেশি দীর্ঘ। তার বিপরীতে, কখনো-কখনো তো এমনও মনে হতে পারে, মানুষের বেঁচে থাকার সময়টি যেন বড় ছোট, বড় কম, বড় সঙ্কীর্ণ। একেবারে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষকে যদি এই প্রশ্নটির সচেতন উত্তর দেওয়ার সময় দেয়া যেত, এই উত্তরের মায়াটিকে যদি তার আয়ুষ্কালের বাইরে রাখা যেত, ক-টি সম্বন্ধের স্মৃতি তার মনে এখনো জেগে উঠছে—তা হলে, মানুষ হয়তো উপায়হীন উচ্চারণ করত, শুধু তার নিজের শরীর, সেই শরীরের অসহনীয় কষ্ট, অথচ সে-কষ্টের শেষ দুয়ারটুকু আর পেরতে না পারা। কোনো সম্বন্ধকে কোনো পরিণতির দিকে নিতে না পেরে মানুষ তার শরীরটুকুতেই আটকে যায়—যা অন্য কারো অন্য কোনো-কোনো সম্বন্ধের পরিণতি, যা অপর জন্মের অপর এক পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধের ফল। যে-সম্বন্ধের জন্যে আমাদের কত জন্ম-জন্মান্তরের দরকার ছিল, তা শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল একটা মানুষের এমন কয়েক বছরের জীবনের ইতিহাস, যা শুনতে একটি হাতের সবগুলি

অঙ্গুলিকরও দরকার হয় না। কিন্তু এর উল্টোটাও তো হতে পারে। সেই মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই কোথাও অনন্ত প্রবেশ করেছিল, আর সেই ক-টি বছরই অনন্ত হয়ে গেছে, যে-অনন্ত অঙ্গুলিকরে পরিমেয় নয়, যে-অনন্ত নক্ষত্ররাজির তুল্যতাতেও গণনীয় নয়, যে-অনন্ত সমুদ্রের অসীমতাতেও চিহ্নযোগ্য নয়। তাই যদি হবে, তাহলে সেই কয়েকটি ক্ষণ বা মুহূর্ত তো আমাদের জীবন থেকে আলাদা হয়ে যাবে, সেই কয়েকটি ক্ষণ বা মুহূর্তকে আমাদের জীবনে আমরা তো আমাদের জীবনের অনন্তের বাহন বলে ভ্রান্তিহীন চিনে নিতে পারব? যত স্বল্পই হোক মানুষের আয়ু, তবু সে তো তার সেই কয়েকটি ক্ষণকে অনন্তস্পৃষ্ট বলে জেনে যাবে, জেনে বাখবে? আমাদের জীবনে তো তেমন ঘটল না, তেমন ঘটে না। আমরা শুধু সেই মুহূর্তে কখনো-কখনো কেউ-কেউ আরোহণ করতে পারি, যে-মুহূর্ত, ঐ মুহূর্তস্থায়ী অনন্তেরই স্বাদ দেয়। সেই মুহূর্তটিকে আমরা অনন্ত করে নিতে পারি—'কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়িলু, না বুঝিনু কৈছন কেলি!' 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল!' তাহলে আমাদের সব অনন্তই সেই মুহূর্তনির্ভর? সব ঝিনুকে যেমন মুক্তো ঘটে না, সব মুহূর্তে তেমনি অনন্ত ঘটে না। কে চিনে নিতে পারে সেই অনন্তগর্ভ মুহূর্তটিকে? স্মৃতি? তাহলে, আমাদের সব অনন্তই স্মৃতিনির্ভর? সেই মুহূর্তের স্মৃতিনির্ভর? যে-জন্মান্তরের দিকে আমরা নিজেদের বইয়ে দিতে চাই, সেই জন্মান্তরও কি স্মৃতিনির্ভর একটি পলকমাত্র?

ষোল

কোনো কথা বা শব্দ কি সম্পূর্ণ গড়ে উঠতে পারে এই শহরে...

এত খুঁত খোঁটে কারা, এরা? এরা সব কারা, যারা, নিজেরা যা কিছু দেখে না, বা জানে না, তাকেই মিথ্যা বা মায়া বা এমনকী দুঃস্বপ্ন বলেও সাত-তাড়াতাড়ি দুয়ো দেয়। ভালবাসা বলতে কী বোঝায়, তা কি সে কখনো জানতে পারে, যে-কখনো ভাল বাসেনি? ভালবাসা বলতে কী বোঝায়, তা সেই-বা কখন আবার চিনে নিতে পারবে, যে কোনো এক সময় ভালবাসা পেয়েছিল, বা নিজে সে ভালবেসেছিল? ভালবাসা কি এমনই নয়, যা অন্য কেউ চিনিয়ে দিতে পারে না। ভালবাসা কি এমনও হয়, যা অন্য কেউ চিনিয়ে না দিলে সব সময় চিনে নেয়া যায় না? এই অন্য-কেউটা কে? সে কি সবার জোটে, না কারো-কারো জোটে? ভালবাসা কি সেই কচ্ছপের বাচ্চা যে তার মাকে দেখে-দেখেই পুষ্টি পায়? তার বাইরে যা পড়ে থাকে,তা তো ছেড়ে দেয়া

ডিমের মত পচে যায়, শুকিয়ে যায়, খোসা হয়ে গুঁড়ো হয়ে যায়। কচ্ছপের সদ্যোজাত শাবকের সঙ্গে তার মায়ের এমন সূর্যাবর্তজোড়া দৃষ্টি বিনিময়ের জন্য অনন্ত সৈকত, অনন্ত জলরাশি, অনন্ত আকাশ দরকার ছিল। নইলে কোন অবকাশে গড়ে উঠতে পারে সেই দৃষ্টিবিনিময়, যা দেহকে জীবনযোগ্য করে তুলতে পারে? কোথায়, কোথায় দৃষ্টিবিনিময়ের সেই সৈকত, সমুদ্র ও আকাশ? আমার গর্ভের মত সেই সৈকত, সমুদ্র ও আকাশ? সেই সৈকত, সমুদ্র ও আকাশের মত আমার মুক্ত, আবরণহীন গর্ভ?

সতের

কোনো-কোনো ঋতুতে কোনো-কোনো গাছের পর্ণ যেমন ঝরে যায়, আবার সেই একই ঋতুতে অন্য কোনো লতায় যেমন ফুল ফুটে ওঠে, মানুষের কথার যদি তেমন মোচন ও স্ফুরণের ঋতু থাকত...

অনন্তের কথাতেই এমন পেছিয়ে যেতে হয় কেন? অনন্ত তো পেছনে থাকে না, তার তো সব সময়ই সামনে থাকার কথা। 'জনম অবধি' রূপ দেখার কথা আসে কোন ইতিহাসের বা ভূগোলের নিরিখে? জন্ম থেকে কেউ কাউকে দেখে না, যারা পুরুষ ও নারীর সংজ্ঞায় নিজেদের বাঁধবে। কিন্তু যতক্ষণ সেই সংজ্ঞা তৈরি হয় না, ততক্ষণ তো আমার জন্মই হয়নি, পুরুষের জন্ম। তাই হিশেবটা শুরু হয় সেই জন্মক্ষণ থেকে। সেই জন্মক্ষণের পর থেকে এই শহরটাকে আমরা তৈরি করে তুলি, আমাদের পায়ে-পায়ে, আমাদের হাতে-হাতে। আমরা দুজন কী নিশীথ নির্জনতায় হেঁটে গেছি এই শহরের কত জানা ও অজানা কবর, ওবেলিস্ক ও সেনোটাফগুলির পাশ দিয়ে। আমরা কত শতাব্দান্তরের মার্বেলে খোদিত ইতিহাসকে বলেছি আমাদের অনুসরণ করে এই শহরে প্রবেশ করতে। আমরাই তাদের প্রবেশাধিকার দিয়েছিলাম। আমার পৌরুষের কোনো পৃথক ক্ষমতা ছিল, তা নয়। তার নারীত্বের কোনো পৃথক মোহনীয়তা ছিল,তাও নয়। আমি ও সে মিলে যেন এই শহরের ঐতিহাসিক কালের কোনো সিলমোহর আঁকার অধিকারী কোনো আধিকারিক। এই শহর তার বিতর্কিত জন্মক্ষণ থেকে শুরু করে আমাদের এই সময় পর্যন্ত যে একটা ধারাবাহিকতা পায়, তা তো, আমাদেরই সৌজন্যে।

আঠার

বাতাস যদি সব মুছে না ফেলে, নতুন সব অক্ষর খোদাই করে তুলতে পারত, তাহলে নদীর স্রোতে কিংবা পাহাড়ের ঢালে কিংবা মহাবৃক্ষের পাতাগুলিতে

বা জলের অভাবে ছেড়ে আসা গ্রামের অর্থহীন পাড়ে, এমন কত অক্ষর খোদিত হতে পারত...

কোথাও কি কোনো পাহাড়ের ঢাল ছিল যেখানে আমি তার জন্যে, আমার পুরুষের জন্যে, অপেক্ষায় ছিলাম? মেয়েদের শরীরেও নানা ঢাল থাকে, সেইজন্যেই পাহাড়, কিংবা নদীর পাড়, কিংবা আকাশের ঢাল দেখলে নিজের শরীরের কথাই মনে আসে। যেন মনে হয়, ঐ ঢাল কোনো এক অতীতে আমার অপেক্ষার শয্যা হয়েছিল। কোনো এক অতীতে, মানে যে-অতীত সব সময়ই অতীত হয়ে থাকে। আমরা কেউ কখনো জানতে চাইনি, সে-অতীত কখনো বর্তমান ছিল কী না। আর, এ কোন অতীত, কোনো অতীতে থাকবে যেখানে আমার এই নারীশরীরের ঢাল আর নিজেরও অজানা নমনীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় কোনো গাছের কাণ্ডের ঋজুতায়, বা কোনো আগুনের, বাতাসে হাততোলা, শিখায়। আমি সেই গাছে ভর দিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম না, একেবারে গাছ হয়ে যেতে পারতাম, তাহলে, তাকে আর-একটা গাছ হয়ে আমার সঙ্গে মিশে যেতে হত অথবা আমার পুরুষকে তার দুই হাতে আমার শিখার পাণিগ্রহণ করতে হত। তারপর আমরা দুজনই আগুন হয়ে জ্বলতাম। একেই তো মিলন বলে—আমাদের মিলন, আমার পুরুষের সঙ্গে আমার মিলন। আর সে-মিলন এমনই যাতে অনেক, অনেক সময় আমি যখন সম্পূর্ণ একা, কুঞ্জে অথবা টিলায়, তখনো আমি অনিঃশেষ মিলনেই থাকি। পাহাড়, টিলা—এদের কত নামকরণ হয় সেখানে আমার যাবার বেলা দিয়ে, বিহানটিলা, সাঁঝপাহাড়। অথবা আমার যাবার পথের আকাশ দিয়ে রোদপাহাড়, ঝরনটিলা। কত নাম, কত নাম। সেই সব কাল পাথরের পাহাড়ে অশ্বারোহী সশস্ত্র সব রাজাদের ওঠা বারণ, পাহাড় তাদের কাছে অনধিগম্য হয়ে ওঠে। আর যেই আমি, চোখে কাজল লাগিয়ে সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে পা দেই, পাহাড় তার দরজা খুলে দেয়।

উনিশ

হাওয়া কি মৃতের জন্যে লেখা অক্ষর প্রেতলোক পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে পারে। অথবা, অক্ষরগুলো শুধু স্মারক। অক্ষর না লিখে পাথরের পর পাথর, পাথরের পর পাথর, আলগা, সন্ধিহীন, চাপিয়ে-চাপিয়ে, আমরা স্মারক গড়ে রেখে যাব কি এই আমাদের পথের নিশানা দিয়ে? যে অক্ষর চেনে না, অক্ষর যার কাছে পৌঁছায় না, পাথর তাকে মর্ম করিয়ে দেবে? কিছু?

কত ভাষান্তরে এ-শহরের কত সমাধিপ্রান্তরে সমাধিফলকগুলি লেখা। সে-সব ভাষা তো আমরা জানি না। মৃতের কি কোনো মাতৃভাষা থাকে ? নাকী মৃতেরই এক মাতৃভাষা থাকে ? এই শহরে, আমাদের এই শহরে, আমরা দুজন দুজনের হাত ধরে কি শুধু সমাধিপ্রান্তরগুলোর পাশ দিয়ে বা মধ্য দিয়ে, সমাধিফলকের দুর্বোধ্য লিপিগুলি অপাঠ করতে-করতে হেঁটেছি, শুধু হেঁটেছি। আমরা যখন তেমন হাঁটতাম, তখন মনে হত, আমাদের এই সপ্তপদীর শেষ নেই, যেমন তার কোনো আরম্ভও ছিল না। এখন তো বছরের, বা এমনকী মাসের, বা এমনকী দিনের হিশেব কষে, কেউ একজন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের মত, ডাইনে-বাঁয়ে মিলিয়ে দিতে পারে, আমাদের যেটুকু জমা ছিল আমরা কেবল ততটুকুই খরচ করেছি, বড় জোর কোথাও কোনো ঋণ নিয়ে হয়তো জমার অঙ্কটা বাড়িয়েছি, খরচের অঙ্কের সঙ্গে সেটা মেলাতে। যে-জীবন অতিবাহনের পক্ষে আমাদের এক জন্ম যথেষ্ট ছিল না, সে-জীবন এই একটা ছোট শহরের সমাধিপ্রান্তরগুলির মধ্যে অগণন সমাধিফলকের ভিতর কোথাও দুর্বোধ্য লিপির স্মারকপ্রস্তর হয়ে গেল। আর তাই যদি হল, আমরা যদি এক জন্মেরও সম্পূর্ণটা মিলনে কাটাতে না পেরে থাকি, তাহলে, এই অঙ্গুলিমেয় কয়েকটি বছরে তুমি এই শহরটাতে তোমার স্মৃতির এত অভিজ্ঞান ছড়িয়ে দিলে কেমন করে ? কখন ? এই শহরেব এক চিলতে মাটিও নেই, এক চিলতে ম্যাকাডাম নেই, এক চিলতে ফুটপাথ নেই, যেখানে তুমি পা রেখেছিলে, অথচ সেই মাটি, বা ম্যাকাডাম, বা ফুটপাথ তোমার চরণরেখা ধরে রাখেনি। এ যেন সেই সৈকত, যেখানে তোমার পা ভেজা বালিতে ছাপ রাখার পর সমুদ্র নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়েছে, পায়ের ঐ চিহ্ন যেন ধুয়ে না যায়।

কুড়ি

বাতাস কি সময়কেও বহন করে ? নাকী সময় বাতাস মেনে চলে না। যদি তাদের গতি এক হত ও তারা পরস্পরকে আশ্রয় দিতে পারত, তাহলে এই কথাগুলো আজ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারত।

আমাদের মিলনে কি চিরদিনের জন্যেই সে পুরুষ ও আমি নারী ছিলাম ? মিলনে কি কে নারী ও কে পুরুষ তা চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত থাকে ? মিলনেই তো মানুষ এক তার লিঙ্গ ভুলে যেতে পারে। স্তনের আধার দেহ বদলে যায়। নিতম্বের স্থানান্তর ঘটে। যোনি ও উপস্থ শরীর বদল করে। এমনকী আমাদের মাথার ও বুকের চুল ও রোমরাজির রোপণান্তর ঘটে যায়।

নিজের শরীরের এই বিস্মরণই তো মিলন। বিপরীত শরীরের এই অধিকারই তো মিলন। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। প্রতিটি অঙ্গই রূপান্তর চায়। আমরা নিজেরাই নিজেদের বিধাতা। আমরা ছাড়া এই সৌরলোকে আর-কোনো জীব আছে কি, যারা শুধু নিজেদের ইচ্ছাতেই মিলিত হতে পারে ও সেই মিলনে নিজেদের শরীরের এমন অদলবদল ঘটাতে পারে ? যে-মিলনে বিধাতানির্দিষ্ট লিঙ্গের এই রূপান্তর ঘটে না, সে-মিলন মানুষের মিলন নয়, হয় দেবকর্তৃক নয় পশুকর্তৃক ধর্ষণ। এক দেব ও পশুদেরই কোনো স্বেচ্ছারূপান্তর নেই। না সো রমণ, ন হাম রমণী—এমন নিশ্চয়তা মানুষ ছাড়া আর কে দিতে পারে, নিজেকে ও তার মিলনের অদ্বিতীয় সঙ্গীকে। সেই দৈবজ্ঞানহীন, ভবিষ্যের নিশ্চয়তাহীন, অতীতের ভারহীন ও সেই মুহূর্তেও অনুমানহীন রূপান্তরসর্বস্ব মিলনের পর কোথা থেকে শ্বাস উঠে আসে, না বুঝনু কৈছন কেলি। আমাদের সেই মুহূর্ত, সেই মুহূর্ত, সমস্ত স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে কোনো স্মৃতির অনুকরণ করে না। সে কোনো স্মৃতির সঞ্চয় বাখে না। সে শুধু এক সানুদেশ আবিষ্কার করে, দুইটি শরীরেব তৈরি এক সানুদেশ, আর সেই এক সানু থেকে অপর সানুর দিকে আবার যাত্রা শুরু করে। সানু থেকে সানুতে আরোহণ। আরোহণ। সানু থেকে সানুতে। আবোহণ। সে-আরোহণে কি আমরা কখনো দুজন দুজনই থাকি। মাধব মাধব সোঙরিতে সোঙরিতে সুন্দবী ভেল মাধাই।

একুশ

বাতাস কি কখনো মাটি পর্যন্ত নেমে আসে, একেবারে মাটির ঘাস বা পাথর পর্যন্ত ? যদি অতটাই নেমে আসতে পারত, তাহলে, সেই মাটি বা পাথরের ওপর জমে থাকা সব আবরণ খসে যেত আর সেই পাথরের পদরেখার পাঠোদ্ধার ঘটত।

সেদিন কী করে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম এমন কোনো শহরতলিতে, যা আর শহরতলি থাকছে না, শহর হয়ে উঠছে, কী দ্রুত ? অহোরাত্র নগরপত্তনের শব্দ কাঁপে। এখন আর কোথাও শহরতলি নেই, সব শহর হয়ে যায়। কোনো মিনিবাসে কি অপরিচিত একটি নাম দেখে আমাদের লোভ হয়েছিল সেই অপরিচয় উদ্ধার করার, অথবা সেই অপরিচয়ের স্পর্শ পাবার ? নিজেরা আমরা কি একটু বেশি পরিচিত হয়ে উঠছিলাম নিজেদের কাছে ? অথবা, আমাদের ভিতরে অহোরাত্র তো কাজ করে, যাকে চিনি না, জানি না,

তার ভিতর দিয়ে চলার একটা ইচ্ছা। মিনিবাসে তুমি উঠেছিলে, যেন রথারোহণ করছ, সুভদ্রার মত, এবার অশ্বের বল্গা দুহাতে ধরবে। কিন্তু আমরা বসলাম গিয়ে একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে, কারণ, সেখানেই একজনের বসার মত জায়গা ছিল। মিনিবাস তখনো মালিকের পক্ষে লাভজনকভাবে লাদাই হয়নি। তাই সে-বাস চলছিল টিকিয়ে-টিকিয়ে, রাস্তা থেকে প্যাসেঞ্জার কুড়োবার আশায়। এ-সব ওদের হিশেবের ব্যাপার। আমরা যে ঐটুকু জায়গাতেই বসতে পেরেছিলাম—তাতেই যেন ঐ মিনিবাসের ভিতর এক প্রান্তর ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন প্রান্তরে টিভির ডিসকভারি চ্যানেলে জিরাফের পালের ছুটে যাওয়া দেখা যায়। জিরাফের পালের ছুটে যাওয়ায় তো মাটির সঙ্গে আকাশও অনেকটা অতিবাহিত হয়। তারপর, সেই মিনিবাসটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে গেল, সেখানে বাধ্যত নেমে, আমরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করছিলাম, মিনিবাসের রুটে এমন জায়গাও আছে, যেখানে দিঘির পর দিঘি, কাল জল আর সে-সব দিঘির এক-এক দিকে ঘাট বাঁধানো, সে-ঘাটগুলোর অনেক ধাপ, সে-ধাপগুলো চওড়াও বটে, মানুষের ভেজা পায়ে সে-ঘাটের বাঁধানো চাতাল ও ধাপ যেন নিকনো। আর কচুরিপানাহীন জলের অতটা বিস্তারে কখনো-বা হাঁসও ছিল দু-একটা। কিন্তু পুকুরগুলো তাদের নাম হারিয়ে ফেলেছে। জিগগেস করে আমরা জেনেছিলাম, এগুলোকে এখন এক নম্বর ট্যাঙ্ক, দু নম্বর ট্যাঙ্ক, এরকম বলে।

বাইশ

বাতাস দিয়ে যদি কোনো আকার তৈরি করে তোলা যেত, তাহলে এই কথাগুলিকে একটা কোনো আকার দেয়া যেত। কিন্তু বাতাস তো শূন্যতা ছাড়া বইতে পারে না, আর বাতাসকে স্পর্শ করে আমরা সেই নিয়তশূন্যতাকে ছুঁয়ে রাখতে চাই।

তোমরা বুঝবে না, একেবারে বুঝবে না, মেয়ে, শুধু মেয়ে হওয়ার, আর শুধু মেয়ে-থাকার কী সুখ। আর কী অধিকারের বিস্তার। আমি যদি মেয়ে না হতাম, তাহলে কি এত যত্ন করে আমার এই চুলগুলিকে এত লম্বা করে তুলতাম? আর এতটা লম্বা না হলে কি আমি নিজেই জানতে পারতাম যে আমার চুলগুলো বয়ে গেছে জলের স্রোতের মত এক কুঞ্চন নিয়ে। সেই কুঞ্চন আমার কপালের প্রায় ঢাল পর্যন্তই নেমে এসেছিল, যেন, আর সামান্য এক আঙুল এগলেই এই কুঞ্চিত জলস্রোতকে, এই কাল, কুঞ্চিত জলস্রোতকে

ঝাঁপ দিতে হত আমার মুখের অথৈ খাদে। ফলে, আমার কপাল, বা যাকে বলে সীমন্ত, তা হয়ে থাকে যেন স্রোতস্বিনীর পাড়। তাতে প্রতিরক্ষা আছে বটে কিন্তু একটা ভাঙন যেন জেগে থাকে। এতটা লম্বা, আর এতটা ছড়ানো, আর ঐ একটু কুঞ্চিত বলেই আমার পিঠ ছাপিয়ে, কোমর ছাপিয়ে কী এক অস্থিরতা যেন সব সময়ই বয়ে যায়, আমি যেন সব সময়ই খুব অগভীর অথচ খুব খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর নুড়িগুলোর ওপর শুয়ে আছি আর আমার ওপর দিয়ে, আমার ঘাড় থেকে পিঠ ও গোড়ালি বেয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আমি এই চুলের রাশি দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিতে পারি—আমার কোনো আবরণের দরকার হয় না। আমি আমার এই খোলা চুল দিয়ে তোমার পায়ের পথের ধুলো মুছিয়ে দিতে পারি, আমার দ্বারে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে যে-পথ তোমাকে পেরতে হয়েছে--যে অন্তবিহীন পথ। তোমাকে কি এতভাবে নিজের করে নিতে পারতাম যদি আমি মেয়েই না হতাম—তোমার পৌরুষের কৃষ্ণ বর্ণকে মাথার বেণী করতে পারি। আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুক। দিয়া চাঁদ মুখে মুখ, পুরিব মনের সুখ, যে বলে সে বলুক পাপ-লোকে। তুমি তো মণিমুক্তো নও যে তোমাকে গলায় গেঁথে রাখব, তুমি তো ফুল নও যে তোমাকে মাথায় গুঁজে রাখব। যদি আমি মেয়ে না হতাম তাহলে তোমাকে আমার ভিতরে লুকিয়ে রাখতাম কী করে ? মেয়ের শরীরেরই তো এ অদৃশ্যতা আছে।

তেইশ

নদীর ওপর দিয়ে যে-হাওয়া বয়, সে কি মোহানা থেকে উৎসের দিকে বইতে থাকে আর সেই পথে কোথাও হারিয়ে যায়, নাকী সে শুধু খেয়ার মত এপার-ওপার করে যায়।

সেখানেও সৌধ ছিল, ওবেলিস্ক, গঙ্গাতীরে, এ-শহরের পশ্চিম সীমাবাহিনী গঙ্গার তীরে। কারা নাকী কবে কোন ভোটে মন্ত্রী হয়েছিল। আর 'মন্ত্রী' নামটা এতই পৌরাণিক যে, যে-কোনো লোকই মন্ত্রী হয়ে পৌরাণিক হয়ে যেতে চায়। তারা, বা সেই মন্ত্রীরা, তখন সবাই মিলে একটা ইতিহাস বানাতে লেগে যায়। ইতিহাসই যদি বানাতে না পারে, তাহলে মন্ত্রী হয়ে তার লাভ হল কী ? সে কি কেষ্টনগরের কুমোর যে বাপ-ঠাকুর্দা যে-পুতুল বানাতে শিখিয়েছে, সে-ও তার ছেলেকে তেমনি পুতুল বানাতে শিখিয়ে যাবে ? তার বাপ-ঠাকুর্দা তো কেউ মন্ত্রী হয়নি, তাহলে সে-ই বা তার ছেলেকে কী করে

মন্ত্রী হওয়া শেখাবে? তাই সে ইতিহাস বানায়, এই শহরটা নাকি তিনশ কয়েকবছর আগে জন্মেছিল, কারণ সেইদিন এক শাহেব তার জাহাজ থেকে এই শহরে নেমেছিল। মন্ত্রীর বানানো এই ইতিহাসটাকে হেঁটে-হেঁটে ঘষে-ঘষে উঠিয়ে দিতে আমরা সেই এক প্রাচীন রাস্তা ধরে সেদিন সকাল থেকে হাঁটছিলাম—চিত্রেশ্বরী মন্দির থেকে গঙ্গার পাড় দিয়ে দিয়ে কালীঘাটের মন্দির। এই পথ, এই তীর্থপথ, মন্ত্রীর শাহেবের চাইতে প্রাচীনতর। আমরা সেই প্রাচীনতর ইতিহাস উদ্ধার করতে-করতে হাঁটছিলাম, সেদিন সকাল থেকে, দুপুর ধরে, বিকেল পেরিয়ে, সন্ধে পর্যন্ত, গঙ্গার তীর ধরে-ধরে। সেখানেও সৌধ ছিল, ওবেলিস্ক। এই প্রাচীন পথে তুমি সেই সারা দিন ধরে হয়ে উঠেছিলে তীর্থযাত্রিণী, এই শহরের। তোমার পথ-চলায় কখনো কোনো রেল লাইন টপকে, কখনো কোনো শ্মশানের পাশ দিয়ে, কখনো কোনো সেতুর ছায়ায়-ছায়ায়, কখনো কোনো গুদামের পেছন দিয়ে, কখনো করিন্থীয় কলমে তৈরি কোনো পরিত্যক্ত প্রাসাদের সামনে দিয়ে, তোমার পথচলায়, তুমি এই শহরের দ্বারপালিকার মত হাঁটছিলে। তোমার হাঁটার পথের পাশেও সৌধ ছিল, ওবেলিস্ক।

চব্বিশ

জলে ভাসিয়ে দিলে জল যেমন শরীরের মাপ আর ওজন অনুযায়ীই সরে যায় আর জলের সঙ্গে ঘটে শরীরের এক আশ্লেষ, বাতাস কি তেমনি আমাদের শরীরকে নিজের শরীর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে? অথবা বাতাসের কোনো গ্রহণও নেই, কোনো বর্জনও নেই। জলে রেখা আঁকা যায়, বাতাসে যায় না।

এই শহর, এই সেই শহর, সেই শহর, এই সেই শহর। আমি এ-শহরের অক্ষ ধরে ঘুরেছি আমার সঙ্গীর হাত ধরে। তারপর এই শহর তার অক্ষ হারিয়েছে। আর-একটা লাটিম যেমন তার অক্ষের আবর্তনক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেলে টাল খেতে থাকে, এই শহরে, এই সেই শহরে, সেই শহরে আমি টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে এদিক-ওদিক গড়িয়ে গেছি, কখনো-কখনো হাইড্রান্টেও। এই শহর, এই সেই শহর, যার নাভি থেকে পরিধি ও পরিধি থেকে নাভি আমি বারবার, সংযুত করে গেছি। তারপর সেই চাকার নেমি ঘূর্ণির বেগে আমাকে কোনো এক দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। এই শহর, এই সেই শহর। অথচ যারা জানে, তারা আমাকে বলেছিল, অথচ যারা জানে আমার পুরুষ কোন দিকে গিয়েছে, তারা আমাকে বলেছিল, সে এখন কোন দিগন্তের মুখোমুখি

চলছে। সেখানে আদিকাল থেকে বসবাস করে যারা, তারা তাদের তীরের ফলার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করছে। গিরিবর্ত্ম তৈরি করে সেখানে পাহাড় চিরে জলপ্রপাত নামে। কামারের নেহাইয়ের মত আগুনে টকটকে পাথরের ওপর সে পা ফেলছে আর ওপরে উঠছে আর সেই আগুনে পথেরও কত পথ। কিন্তু এই বোলচালের শহর জানেই না—তার পথ চলার ব্যথা আমার কতটাই লাগছে। আমি কি আমার হিয়া পেতে দেব তার সেই চলার পথ ঢেকে দিয়ে, যাতে আগুনে পাথরে তার পা না পড়ে, যাতে আমার ব্যথায় তার চরণপাত ঘটে। কিন্তু আমার ঠিক ঠাহর নেই, আমার হিয়া কোথায়? এই শরীরের কোথাও, নাকী, এই শরীরের বাইরে কোথাও? নাকী এই নেশাতুর শহরটাকে খেপা বলদের মত আমি ঢুঁ দেব, একটা লাঠি দিয়ে ঘুমনো এই শহরটাকে আমি খুঁচিয়ে তুলব, যাতে এই শহর, এই সেই শহর বিরক্তিতে চিৎকার করে জেগে ওঠে? এই শহর, এই সেই শহর কোনো কিছুর পাত্তাই জানে না, আর আমার সমস্ত যন্ত্রণা আর অনিদ্রার ভিতর শুধু ঘুমিয়ে যাচ্ছে!

পঁচিশ

বাতাসকে কি পথ খুঁজে নিতে হয় সমুদ্র থেকে স্থল ও স্থলতরের দিকে, নাকী, বাতাস জলের মত, যেদিকে ঢাল পায়, সেদিকে বয়ে যায়? স্রোত পৌছুবার আগেই স্রোতের পথ স্থির থাকে? যদি বাতাস তার নিজের পথ নিজে তৈরি করে নিতে পারে...

আমাদের যে-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, তা অস্বীকার করে জেগে উঠতে পারে কি স্মৃতি, শরীরের স্মৃতি? এই একই সৌরলোকে অজস্র গ্রহ-নক্ষত্রের মত কোথাও তুমি আছ, কোথাও তুমি আছ। যদি আমাদের একজনের কারো মৃত্যু ঘটত, তাহলে সেই নেতি মেনে নেয়া যেত। আমরা তো জন্ম থেকেই এই নেতির কথা জানি,তাই এই নেতিকে এক রকম মেনে নেয়া যায়। বা, হয়তো সেই নেতি থেকেই আমরা একটা বিপরীত যাত্রা শুরু করি। পর্বতারোহী যেমন শিখরজয়ে উঠবার সময় তার নেমে আসার জন্যে দরকারি রশদও পিঠের ঝোলায় পুরে নেয়। শিখরজয় অনিশ্চিত, কিন্তু জয় করেই হোক আর না-করেই হোক, নেমে আসাটা সত্য। আমাদের সবচেয়ে খাড়া আরোহণেও ফিরে আসাটাই প্রথম ও শেষ সত্য। একজনের মৃত্যু তো আমাদের আর-একজনকে সেই প্রস্তুত অবতরণের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু এই বেঁচে থাকা? সৌরলোকের অজস্র গ্রহনক্ষত্র ও প্রাণের মধ্যে দুটি অস্তিত্ব হয়ে বেঁচে থাকা?

একই সূর্যে ও রাত্রিতে তাপিত হওয়া ও শীতল হওয়া? একই মেঘপুঞ্জের বর্ষণে ভিজে ওঠা? একই শক্ত, তপ্ত, রসহীন মাটির মত আকাশের জল শুষে নেয়া? মাটির তলায় জলের সঞ্চয় উপচে উঠলে একই বন্যায় ভেসে থাকা? অথচ সে-বন্যা কোনো স্রোতের ভাঙনে আমাদের দুজনকে দুজনের দিকে টানে না। যে-স্রোতে গ্রাম, শহর, সেতু ও বাঁধ সমস্ত গ্রন্থন ও সংগঠন ভেঙে, স্রোতে শুধু ভেঙে ও ভেসে যেতে থাকে, সে স্রোতও কখনো আমাদের দুজনকে আর দুজনের দিকে টানে না। এমন পরম বিস্মরণের মধ্যে কি শরীরের আকার কোনো জায়গা পায়, বন্যাস্রোতের মুখেও জেগে থাকা কোনো চরের মত, বা, মহামল্লপুরমের সামুদ্রিক শিলার মত, ঢেউ শুধু যাকে লবণাক্ত আঘাত করে বিচ্ছুরিত ফেনপুঞ্জে ছিটকে পড়ে অহোরাত্র? সে-বিচ্ছেদের কোনো আকার নেই। শরীরের শুধু বর্তমান থাকে, শরীরের কোনো স্মৃতি নেই। থাকে না।

ছাব্বিশ

বাতাসের শুধু বর্তমান আছে, শুধু এই মুহূর্তের বয়ে যাওয়া আছে। বাতাস যে-পলক পেরিয়ে এল, সে-পলকে আর ফিরে যেতে পারে না। মুহূর্ত-ব্যাপ্ত এ-বাতাস তার বহমান সময়কে ওলোটপালট করে দিতে পারে, কিন্তু কিছুতেই তার এক পল অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। যদি পারত, ও বাতাসের যদি জলেরই মত বিস্মরণক্ষমতা থাকত, তাহলে, এই কথাগুলির লুপ্ত মুহূর্তটিতে বা মুহূর্তের সমবায়ে, একবার, শুধু একবার ফিরে যাওয়া, বা ফিরে যাওয়াই না, এই লুপ্ত মুহূর্তগুলিকে বা মুহূর্তের সমবায়টিকে, একবার এক ঝলক দেখা যেত।...

ঠিক কখন আমার মনে হয়েছিল, আমার এই অশেষ মিলনেও কোনো এক শূন্যতা ফিরে-ফিরে আসছে আমার শরীরের ভিতরে শরীরে কোথাও? সে বোধহয় শূন্যতাও নয়। শূন্যতার কথা আসবে কী করে, তখন? আর তখন তো আমাদের জানা ছিল না—পূর্ণতার এই নিমেষবিরতিহীন আস্বাদন প্রতিটি মুহূর্তে, আমাদের সেই চির অমিলন, চির বিচ্ছেদের দিকে ঘূর্ণাবর্তের বেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণির সে-বেগ, সেই অতল টান আমরা শরীরের কোথাও বুঝি নি। তখনো সে-বোঝার সময় আসেনি। তবু, এই শরীরের ভিতরে শরীরের জলরাশির কল্লোলে ও স্রোতের ভিতর থেকে কোথাও একটা বিষাদ জেগে উঠেই মিলিয়ে যেত, যেন এই আমার শরীর যা নির্মাণ করতে পারত, তা নির্মাণ করে তুলছে না। ঠিক বিনষ্টি নয়, ঠিক অসম্পূর্ণতাও নয়, অমন

মিলনের পর আবার মিলনের জন্যে শরীরের ভিতর থেকে যখন শরীর জেগে উঠত, তখন, কোথায় একটা বিদ্যুলতা দেখা দিয়েই শরীরের দিগন্তে মিলিয়ে যেত। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়, সমুদ্রভূমিতেও মরীচিকা দেখা যায়, শরীরের ভিতরেও কি তেমন মরীচিকা তৈরি হয় আর মিলিয়ে যায়? যে-মরীচিকা দেখা যায় না, শোনা যায় না, তা আমি কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝব? নাকী, এ-মরীচিকা বুঝতে ইন্দ্রিয়াতীতের দরকার হয়। আমার অপেক্ষা ছিল —সেই অনাহুত অতীন্দ্রিয় যদি কোনো গভীর ঘুমের মধ্যেও জেগে উঠে মিলিয়ে যায়, আমি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠবার জন্যেও অপেক্ষা না করি। আমি বুঝে ফেলেছিলাম—সেটুকু দেরিও তার সইবে না, সে আবার আমার ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যেই কোথাও আড়াল নেবে। এ যেন সমুদ্রের জলের তলের একটু গভীরে চলে যাওয়া কোনো রশ্মির সঙ্গে এক ডলফিনের নিঃসঙ্গ জলক্রীড়া। সমুদ্রের জলরাশির নিয়ত পরিবর্তমান রসায়নের কোনো এক কারণে, সূর্যের ঐ একটি রশ্মিই জলতল ভেদ করতে পেরেছিল। বা, এ হয়তো সূর্যের তেমন রশ্মিই নয়, যা আমরা দেখতে পাই। জলের কোনো এক মিশ্রণে সূর্যের অদৃশ্য রশ্মিগুলির কোনো একটি হয়তো জলতলে গিয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল আর সেই ডলফিন তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল, সমুদ্রতলের সেই আলোর কণাটিকে নিয়ে খেলছিল। যদি কেউ তা দেখতে পেত, তাহলে সে ভেবে নিতে পারত, এ-জলক্রীড়া নিয়মিত কোনো ঘটনা। আমি আমার শরীরের ভিতর থেকে জেনে গিয়েছিলাম—সমুদ্রজলের রসায়ন যে-কোনো নিমেষে বদলে যেতে পারে, সমুদ্রতলের সেই আলোকবিন্দু যে-কোনো পলকে নিবে যেতে পারে, ডলফিন যে-কোনো ক্ষণে অন্য কোনো খেলার দিকে ঢলে যেতে পারে। ঠিক প্রস্তুতি নিয়ে নয়, ঠিক আয়োজন করেও নয়, ঘুমের মধ্যেও, গভীর ঘুমের মধ্যেও, আমার এমন একটা জাগরণ লেগে থাকত, যে, সেই অতীন্দ্রিয় যদি ঘুমের মধ্যেও জেগে ওঠে, তাহলে, সে যেন ঘুমের মধ্যেই, মিলিয়ে যেতে না-পারে, যেন আমাকে জেগে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না হয়। তখন আমি জাগরণে জড়ানো সেই ঘুমের গভীরতায় তলিয়ে যেতে পারতাম, কেমন করে, তা আমি পরে বুঝেছি। তখন, সোনার জন্মের পর ঘুমের ভিতরেই স্তন দুধে ভারী হয়ে উঠত আর সোনাকে টেনে নিতাম। কিন্তু সোনা যখন আমার ইচ্ছের ভিতর এসে গেছে, তখন এক ঘুমের নিরন্ধ্রে অন্ধকার এমন আলোয় ঝলসে উঠেছিল যে আমি শুধু এইটুকু নিশ্চিত জেনে গিয়ে ঘুমিয়েই থাকি যে আমি আমার গর্ভকে পূর্ণ করতে চাই। আমি গর্ভসঞ্চার চাই, গর্ভধারণ চাই, সন্তানপ্রসব চাই। সেই গভীর ঘুমের ভিতর আমার এই,

শূন্যতা বললে শূন্যতা, মরীচিকা বললে মরীচিকা, আকাঙ্ক্ষা বললে আকাঙ্ক্ষাকে, অমন নিশ্চয়তায় চিনে নিতে পেরেছিলাম, সেই অতীন্দ্রিয়ের ঝলককে যখন ঘুমের ভিতরেই তারার আলোর মত অকম্প ও স্থির করে নিতে পেরেছিলাম, তখন আমি জেগে উঠিনি। আমার গর্ভ এক অলৌকিক আলোতে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল। এ দ্যুতি আমি সইতে পারছি না—আমার এই নিদ্রিত অধৈর্যে আশ্বাস শুনেছিলাম, সয়ে যাবে, সয়ে যাবে।

সাতাশ

বাতাস কতটা আত্মগোপন করতে পারে ? আমাদের অনুভবের কতটা আড়ালে চলে যেতে পারে ? বা, আসলে, অনুভবের ভিতরে ? বাতাস যদি খুঁড়তে পারত, তাহলে লুপ্ত-আকাঙ্ক্ষা উদ্ধারের মত কিছু ঘটতে পারত হয়তো।

আমার কোনো অতৃপ্তি ছিল না, তাই আমার কোনো আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। আকাঙ্ক্ষার ভিতর কখনো-কখনো অপ্রাপ্যতা নিহিত থাকতে পারে। আমার তেমন কিছু ছিল না। আমাদের প্রতিটি মিলনই ছিল একটি নতুন অভিযান। যারা সমুদ্রে পাড়ি দিত, এককালে, পালতোলা জাহাজে, তাদের কাছে এক সমুদ্রের একই পথে দ্বিতীয় যাত্রাও যেমন কখনোই প্রথম যাত্রার পুনরাবৃত্তি হত না, বাতাস আর সমুদ্রস্রোত, এমনকী অন্তঃশীল স্রোতের টানও, তাদের প্রতিটি যাত্রাকেই করে তুলত পুনরাবৃত্তিহীন, যারা এভারেস্টে উঠেছে একাধিকবার, একই পথে, বা ভিন্ন পথে তাদের যেমন পরবর্তী কোনো যাত্রাই পূর্ববর্তী কোনো যাত্রার পুনরাবৃত্তি হয় না, ঐ উনত্রিশ হাজার দুইশ দুই ফুট উচ্চতার প্রতিটি বর্গ সেন্টিমিটার তাদের প্রতিবারই উঠতে হয়েছে ও নামতে হয়েছে, তাদের কোনো আরোহণই তাদের পূর্ববর্তী কোনো আরোহণের পুনরাবৃত্তি নয়, প্রত্যেকটি আরোহণই প্রথমতম আরোহণ, যে-আরোহণের প্রধানতম বোধ অনিশ্চয়তা, তেমনি আমাদের প্রতিটি মিলনই ছিল অতীতহীন, ভবিষ্যৎহীন, এক ও একমাত্র মিলন। কিন্তু স্মৃতি তো অবলুপ্ত হয় না, তাই আমরা পাহাড়ের গা বা সমুদ্রের আকাশে পূর্বপরিচয়ের ইশারা খুঁজতাম, বা, না-খুঁজেই চিনে নিতাম, বা খানিকটা আন্দাজও পেতাম বাতাস কোনদিক থেকে বইছে, বা, হিমবাহের বরফ পাতলা হয়ে গেছে কী না। তাতে সেই অভিযানের জন্যে আমাদের পেশিসমাবেশের, আমাদের শারীরিক শক্তি সমুত্থানের কোনো হেরফের ঘটত না। তবু, আশ্চর্য, অথবা সেই কারণেই হয়তো, সব অভিযান থেকেই আমরা কোনো স্মারক সংগ্রহ করে আনতে চাই, অথবা, আসলে, সব

অভিযানকেই আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই। কিছু থাকবে না চিরস্মরণের, রক্তে-রক্তে এমন মিশ্রণের কোনো স্রোত তৈরি হবে না, যার গতিপথ আমার মৃত্যুর পরও অজানা থাকবে? আমি তার গর্ভে আমার সন্তান চাইছিলাম।

আটাশ

বাতাস জানে, বাতাস কী করে বদলায়, কখন এক দিকে ছুটে চলা বাতাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসার সংঘর্ষ হয়, কখন মাটির তাপে অল্প বাতাস হুহু বেগে ওপরে উঠতে থাকে—আর সেই তপ্ত মাটিরই টানে আকাশ থেকে বাতাস হুহু বেগে নামতে থাকে। বায়ুপথে যদি সংঘর্ষ বাধে, তাহলে ঘূর্ণির টানে বাতাস শুধু নিজেকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

আমার রক্ত আমাকেই ঘিরেই ঘুরছিল, তার আবর্তনের গতিতে কী এক বদল ঘটে গেল। মেয়েদের শরীরের কোন ঘটনাটি মেয়েটির পক্ষে সবচেয়ে রহস্যময়, অজ্ঞাত ও রোমাঞ্চকর—প্রথম ঋতুপাত, না গর্ভসঞ্চারের প্রথম কয়েক দিন বা কয়েক মাস? যে-সব মেয়েরা একটু বেশি জানে, তৈরিও থাকে, তারাও কেমন নিজেকে সামলাতে পারে না। আর, যে-মেয়েরা কিছুই জানে না, তৈরিও থাকে না, তারা যেন কেমন আকুল-অস্থির হয়ে পড়ে। মজা হচ্ছে, কোনো মেয়েই জানে না, তার শরীরের ভিতরে আর-একটি শরীর ধারণ করার ক্ষমতা এসে গেল, এটা তাকে একদিন-দুদিনের মধ্যে কতটা সম্পূর্ণ করে তোলে। তখনো স্তনোদ্ভেদের ব্যথা জাগে। তখনো নিজের সম্পূর্ণতা সারা শরীর জুড়ে একটা প্রস্তুতির আয়োজন সারে। আবার, কোনো মেয়েই জানে না, তার শরীরের ভিতরে আর-একটা শরীর প্রোথিত হয়ে গেছে, এখন তার শ্বাসগ্রহণ ও আহারে সেই ভ্রূণ প্রতিটি লহমায় বেড়ে উঠছে, এই ঘটনা তাকে কয়েকদিনের মধ্যে কতটাই সম্পূর্ণ করে তোলে। তার স্তনের রঙ বদলে যেতে থাকে, তার চামড়াগুলো কোথাও-কোথাও একটা টান বোধ করতে থাকে, তার পায়ের দিকের শিরা-উপশিরাগুলি কখনো-কখনো ফুটে ওঠে, আর মাস তিন-চার পর থেকেই তার গর্ভের ভিতরে ঘটতে থাকে এক স্বাধীন আলোড়ন, তার ইচ্ছা বা প্রস্তুতি নিরপেক্ষ স্বাধীন আলোড়ন, যখন-তখন, ঘুমে বা জাগরণে, বসে থাকলে বা দাঁড়ালে। একটু ভয় জাগে বৈকী! যার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমন একটা আলোড়ন আমাকে আমারই শরীরের ভিতর বইতে হচ্ছে। ভয় লাগবে না? আবার, একটু অভ্যাস হয়ে এলে, কেমন হাসিও পায়। এদিকে জিভের স্বাদ বদলে যায়, ঘুমের সময় বদলে যায়।

ঊনত্রিশ

বাতাসের চাইতে এমন কৌতুকের কিছু আছে কি ? কেমন হঠাৎ দমকা হয়ে উঠতে পারে, কেমন হঠাৎ থিতিয়ে যেতে পারে, কেমন হঠাৎ উদাস পথ ধরতে পারে। বাতাসের মত চতুর আর ক্ষিপ্র আর অনিশ্চিত যদি হওয়া যেত ! বাতাসের যদি কোনো হাসি থাকে, সে-হাসি সবচেয়ে বেশি খোলে নারীর গর্ভসঞ্চারে তার পুরুষের দশা দেখে !

যে-গর্ভ আমার নয়, সে-গর্ভ রক্ষা করার সমস্ত দায় আমার ওপর বর্তালে, বর্তাতে পারে, কিন্তু আমি কী করে সে-গর্ভ রক্ষণাবেক্ষণের দায় নেব ? আমি যা কিছুই করি, তা-ই যেন উল্টে যায়। অথবা, আমি কী করছি,তা দেখে সে তার নিজের আচরণ ঠিক করে। আমি যদি তাকে আরাম দিতে চাই, সে বলে, আমার তো কোনো কষ্ট নেই, তুমি এত আরাম দিচ্ছ কেন ? আমি যদি তার জন্যে কোনো মিষ্টি নিয়ে আসি, কোনো নতুন, একটু অদ্ভুত মিষ্টি, তার কোনো একদিন ভাল লেগেছিল, সেই স্মৃতিতে, তাহলে, সে বলে, ঐ মিষ্টিগুলো আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখো। অগত্যা আমাকে একা-একা সেই মিষ্টিগুলি খেতে হয়, তাও আবার তার চোখের আড়ালে। আমাকে এমন অপরাধী করে তোলে কে ? এরই মধ্যে সেই অনিদ্র অবকাশ আসে, যখন সে দেখায়, সে কতটাই বদলে গেছে, এমনকী বাইরে-বাইরেও। যখন সে বলে, ভিতরের বদল আরো কত জটিল। এরই মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত সেই সব মুহূর্ত আসে যখন তার ভিতরের কোনো আলোড়ন কোনো এক রকমের তৃপ্তি চায় আর তার শরীরের বাইরের সংস্থানও যে কতটা বদলে গেছে তা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আমরা তেমন যৌনতায় মেতে উঠি, যেন, কোথাও কিছু বদলায়নি। মেয়েদের গর্ভ পরিণত হওয়ার সময় তারা তীব্রতর যৌনতার বেগে কখনো-কখনো ভিতরে-ভিতরে প্লাবিত হয়ে যায়। কোনো-কোনো মেয়ে এতে ভয়ও পেয়ে যায়। ভয়টা যদি কাটিয়ে ওঠা যায় তাহলে, আমাকে, তার পুরুষকে আমার শরীর দিয়ে বুঝতে হয়, তার উদরের কঠিনতা। তখন, তখনই, ওর গর্ভ আমারও গর্ভ হয়ে ওঠে।

ত্রিশ

বাতাসে কি সাক্ষ্য রাখা যায় ? বাতাস কি কোনো একটি ঘটনাকে কোনো স্থায়িত্ব দিতে পারে ? এমনকী কোনো শ্বাসকে ? অথবা বাতাস সব সাক্ষ্য লোপ করে শুধু অপলাপটুকু রেখে দেয় ? এই কথাগুলি কি এমনই অপলাপ ?

হঠাৎ একদিন শেষ সকালের দিকে পেটের ভিতরটাতে এমন আলোড়ন শুরু হল যে ব্যথায় আমি দুই হাঁটু বুকের কাছে নিয়ে বসে পড়লাম। মনে হল, শরীরটা কুঁচকে ছোট করে ফেলে আমি আমার ব্যথাটাকে মারি। মনে হল, আমার উদর যদি আমি উদরেরও আরো ভিতরে টেনে নিতে না পারি, তাহলে এই ব্যথা আমার শরীরটাকে ভেঙে টুকরো করে ফেলবে। যে-সব বহুপ্রসূতি নারী ছিলেন তাঁরা 'হায়, হায়', 'না, না,' করে উঠলেন। ব্যথা উপশমের জন্যে তাঁরা কেউ আমার মাথায় হাত দিলেন না, আমার পিঠে হাত রাখলেন না, আমাকে ঘিরে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে শুধু বলতে লাগলেন, 'ব্যথা কমতে দিও না, ব্যথা কমতে দিও না, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, ব্যথা জাগাও, ব্যথা জাগাও'। আমার তখন পূর্ণ গর্ভ। তাঁদের নিষেধ ও নির্দেশ আমি অমান্য করি, ইচ্ছার এমন জোর আমার ছিল না। আমি প্রথমে মাটির ওপর বসে পড়লাম, তারপর ব্যথা সহ্য করতে না পেরে পা দুটো গুটিয়ে নিলাম আর সেই গুটনো পায়েই আমি কাত হয়ে গেলাম মাটিতে। একটি হাতও আমাকে স্পর্শ করল না। বোধহয় ভঙ্গি বদলের জন্যে ব্যথার ধরণটা একটু বদলাল, তবু আমি হাঁটুদুটো গুটিয়ে আমার উদরকে সঙ্কুচিত করে রাখলাম। সেই বহু প্রসূতিরা আবার সমবেত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'পা ছড়িয়ে দাও, পা ছড়িয়ে দাও'। আমি ধীরে-ধীরে আমার ডান পাটা ছড়িয়ে দিলাম, আমি বাঁ কাতে শুয়ে ছিলাম, বাঁ পাটা যেন উদরটাকে একটু আশ্রয় দিচ্ছিল। তাঁরা অপেক্ষা করলেন। যখনই তাঁরা বুঝলেন, আমি কোনো এক ধরণের বিশ্রাম নিচ্ছি, হয়তো আমার শ্বাসপতনে সেটা বোঝা গিয়েছিল, তাঁরা আবার সমবেত স্বরে বলে উঠলেন, 'বাঁ পা ছড়িয়ে দাও, ছড়িয়ে দাও, ব্যথা জাগাও, ব্যথা জাগাও'। আমি আমার বাঁ পায়ের ভাঁজ খুলে দিলাম। আর, তাঁরা যেন জানতেন, দুপায়ের ভাঁজ খুলে কেউ কাত হয়ে থাকতে পারে না। সেই বহু-অভিজ্ঞ নারীরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁদের সেই নীরবতাকে আদেশ মেনে আমি চিত হয়ে গেলাম। আমার হাতদুটোই তখন আমার একমাত্র অবলম্বন। দুই হাত দিয়ে আমি আমার উদর চেপে ধরেছি। আমার সেই কুঞ্চিত চুলের রাশ আমার মাথার পেছনে দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে—ভাসান দেয়া প্রতিমার চুল যেমন ভাসে। আমার ভিতর থেকে সেই ব্যথা আমার কোমরকে ধনুকের মত ওপর দিকে বেঁকিয়ে দিল, আমার দু হাত খসে পড়ল, বাঁ পায়ের ওপর ডান পা আনার জন্যে ডান পা একটু তুলেছিলাম, পা ছিটকে গেল। দুই পা ফাঁক করে, দুই হাত ছড়িয়ে, চুলের রাশ ভাসিয়ে আমি আর্তরব করতেই সেই বহুপ্রসূতিরা সমবেত স্বরে বলে উঠলেন, 'শ্বাস ভিতর দিকে নাও, ব্যথা

ভিতরে নাও, হাঁ করো না, শ্বাস ছেড়ো না, টুঁ-শব্দটি করো না, ব্যথা জাগাও, ব্যথা জাগাও'। তাঁরা কেউ আমার শরীর স্পর্শ করলেন না। সে-ব্যথা তখন আমার শরীরের ভিতরে এমন আলোড়ন তুলেছে যে আমি ভুলে গেছি উদরের ভিতর থেকে সেই শিশু কোন পথে বেরবে। আমার মনে হচ্ছিল, আমার পাঁজরা ভেঙেই সেই শিশু বেরিয়ে আসবে। কোনো এক সময় ব্যথা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। সেই বহুপ্রসূতিরা তখন আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'এটা প্রসববেদনা নয়, ছলব্যথা। তবে ব্যথা ওঠা এই শুরু হল। কতবার উঠবে-নামবে। তারপর প্রসবের ব্যথা উঠবে।' তখন তাঁরা আমাকে ধরে-ধরে বসালেন, আমার চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে আলগা খোঁপা বেঁধে দিলেন। ভেজা গামছা চুপসে তাঁরা আমার কপাল, ঘাড়, গলা, বুক, হাত, হাঁটু পর্যন্ত মুছিয়ে দিলেন। আর এই সব করতে-করতে তাঁরা গর্ভের শিশুটিকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'দেখো, কে আসছেন, মাকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরবেন কোন অবতার, এত ব্যথা দিয়েও যখন থেমে গেল, তখন, নিশ্চয়ই ছেলে, বজ্জাত, মাকে ব্যথা দিয়ে-দিয়ে দেখছে, মা কত ব্যথা সইতে পারে। যে যত মহাপুরুষ হয়, সে তাব মাকে তত ব্যথা দিয়ে জন্মায়। এই ব্যথা দিয়ে-দিয়েই সে তার দাম বাড়ায়। তুমি সাত রাজার ধন এক মানিককে বুকের দুধ দেবে, কোল দেবে আর সে কি ব্যথা নেই, বেদনা নেই, ঝুপ করে এসে পড়বে? সে তো বেরতেই চায় না, পেটের ভিতরের আরাম ছেড়ে কোন দেবতা বেরতে চায়, যেখানে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, ঝড় নেই, জল নেই, খরা নেই, বন্যা নেই, এমন আশ্রয় ছেড়ে কে আর এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় নামতে চায়? তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালবাসার সন্তান, তোমার নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছের সন্তান, তাই সে তোমার কাছ থেকে ভালবাসার আর ইচ্ছের দাম আদায় করে নিচ্ছে। যাদের পেটে শুধু শরীরের সন্তান আসে, তাদের এত কষ্ট হয় না। এমন ছলব্যথা দিযে যখন তোমার শুরু হল, তখন তোমাকে আরো কত ব্যথা সইতে হবে, কে জানে?' আমিও জানি না। কতবার কত ছল ব্যথা উঠল, কমল, তার হিশেব হারিয়ে গেল। আর কখন সেই প্রসববেদনা শুরু হল, যার শেষ হল শিশুর নিষ্ক্রমণে, তারও আর-কোনো হদিশ থাকল না। এসো, ব্যথা এসো, জাগো, ব্যথা জাগো, যে-ব্যথায় আমার শরীরের সব গ্রন্থন ছিন্ন হয়ে যাবে। এক সময় মনে যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল, এখন, তেমনি ব্যথা, তোমার আগুনে আমি দগ্ধ হব। তোমার এমন দেহভেদী নিষ্ক্রমণে আমার সকল বিনয় বাড়বাগ্নি হয়ে উঠবে। কোনো ভাবনা ছাড়া, প্রতিরক্ষা ছাড়া, ভবিষ্যৎ ছাড়া আমি শরীরের যন্ত্রণার শীর্ষে নিজেকে তুলে ধরেছি। যন্ত্রণা,

শুধু শরীরের, শুধু শরীরের যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণায় ছিন্ন হচ্ছে কে? আমারই শরীর? এ-যন্ত্রণায় আমি কোনো স্মৃতিকে টেনে আনিনি। আমার একারই এ-যন্ত্রণা, এ-যন্ত্রণা একা আমারই। আমি এই যন্ত্রণায় পিষ্ট হচ্ছি, বিদ্ধ হচ্ছি, দগ্ধ হচ্ছি—কেউ আমার সহযাত্রী নেই। এমনও কেউ নেই, যাকে আমি চিনি। ব্যথাটা কোন এক সময় যেন পেট থেকে আমার কোমরের দিকে চলে গেল আর মনে হল, কোমরের সমস্ত হাড় ভেঙে, গুঁড়িয়ে, পেশি ও মাংসভেদ করে সে বেরিয়ে আসবে। আমার সেই পশ্চাদ্ভাগই, যেন আমার শরীরের সম্মুখভাগ। কোমরের নীচে যেখান থেকে উরু নেমেছে, সেখানে যেন নিরবচ্ছিন্ন কোনো করাত চালানো হচ্ছে আর আমার উরুর পেশিগুলি লোহার মত শক্ত হয়ে সেই করাতের দাঁতকে প্রতিহত করছে। সেই সংঘর্ষ আরো নীচে আমার হাঁটুর দিকে নেমে যাচ্ছিল। শরীরের ঐ অংশের কোনো পেশি, কোনো হাড় যেন আর শরীরে ফিরে আসবে না। শরীর যখন শরীরকে এমন তীব্রতায় বিদ্ধ করছে, যে-তীব্রতায় আগুন কাঠকে পোড়ায়, হঠাৎ সমস্ত শরীর জুড়ে এক শিথিলতা নেমে এল, যেন আমার শরীরের স্মৃতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল। আমার বুকের ভিতরের কত দিনের রুদ্ধশ্বাস এক হলকায় বেরিয়ে এল।

একত্রিশ

হাওয়া তো দর্পণ নয় যে সেখানে শ্বাসপাতহীনতার নির্মলতা ধরা পড়বে। হাওয়া তো দর্পণ নয় যে সেখানে প্রথম শ্বাসগ্রহণের বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন থাকবে। হাওয়া শুধু মুছে দেয়। সেই মধ্যরাত, আর এই মধ্যদিন।

যাঁরা আঁতুড় ঘরে ছিলেন, সেই বহুপ্রসূতি, অভিজ্ঞা ও প্রবীণাদের মধ্যে কেউ, যাঁদের এখন আর গর্ভ নেই, যাঁদের সন্তানরা এখন আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করে, তাঁদের মধ্যে কেউ, এঁদের কারো প্রসবকালে কোনো দোষ অর্শায়নি, কেউ মৃতবৎসা নন, কেউ কাকবন্ধ্যা নন, এঁরা প্রত্যেকেই বহু গর্ভ ধারণ করেছেন ও প্রতিটি গর্ভকেই নিজের শরীর দিয়ে প্রসব পর্যন্ত নিয়ে গেছেন ও প্রতিটি প্রসবের শেষে সুস্থ, বলবান, ইন্দ্রিয়বান, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাঁদেরই মধ্যে কেউ, কিছু পুরনো শাদা কাপড়চোপড়ের মধ্যে প্রায় লালরঙের সেই সদ্যপ্রসূতকে আমাকে দেখাবার জন্যে আঁতুড় ঘরের বাইরের আলোতে নিয়ে এসেছিলেন। তখন গহন-মধ্যরাত। অন্ধকারই ব্যেপে ছিল সব দিক। আর আলো ছিল খুবই মিটমিটে। তিনি, মাত্র মিনিট পনের আগেও যে

মাতৃগর্ভে ছিল, সেই সদ্যোজাতককে তাঁর দুই হাতের দশ আঙুলে সেই সঘন গহন মধ্যরাতে এমন অভ্যস্ত মুদ্রায় তুলে ধরেছিলেন, যেন, তিনি, মধ্যরাতকেই দেখাতে চাইছিলেন : এই সেই সদ্য জাতক। হয়তো তিনি ঠিক জানতেন না, মধ্যরাতকে কোথায় চিহ্নিত করবেন? অন্ধকারে? আলোর অত্যন্ত ছোট ঘেরের নিষ্প্রভতায়? আকাশের তারায়? তারা আর মাটির মধ্যে অতল তিমিরে? সেটা অনুমানের ক্ষমতা আমার ছিল না। নেইই। যাঁরা রাত্রির গহনতাকে সদ্যোজাত শিশু দেখান, আর সেই শিশুর প্রথম কান্না নিশীথ রাত্রির নৈঃশব্দ্য ও লুপ্ত দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে শিশুটিকে কাঁদান, আর তাকে দুই হাতের অঞ্জলিতে আকাশপুরুষের দিকে তুলে ধরেন, আর এক হলদেটে প্রভাহীন গার্হপত্য শিখায় সেই সদ্যোজাত, আপাদশির নবীন মুখটিকে আলোকিত করতে চান, আমি কী করে জানব, কী করে বুঝব, তাঁরা, এই বহু সন্তানের মায়েরা, এই বহু গর্ভের ধারিণীরা, এই প্রবীণারা কোথায় ঐ মধ্যরাত্রিকে চিহ্নিত করেন, বা, কেমন করে সেই মধ্যরাত্রিকে উপেক্ষা করেন। ঐ হলদেটে আলোর সঙ্কীর্ণ বৃত্তে উদ্ভাসিত করে তোলেন সেই অমল মুখখানির ভাস্কর্য যে-ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, যে-ভাস্কর্য গড়ে ওঠার একমাত্র নির্মাণভূমি, মাতৃগর্ভ, যে-ভাস্কর্য নির্মিত হয়, পুষ্ট হয়, বেড়ে ওঠে ও নিষ্ক্রান্ত হয় সহায়তাহীন এক স্বাবলম্বনে। সেই রাত্রির ঘনতা, গহনতা ও আলোর ছায়াময় বৃত্তে আমি শুধু দেখতে পেয়েছিলাম সেই সদ্যোজাতের মুখভরা দুখানি চোখ, দুখানি সমুদ্রোপম নয়ন, দুখানি মুখব্যাপিত নয়নের দর্পণতা। তখন মধ্যরাত। ভুবনে কোথাও সেই চোখদুটিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার মত যথেষ্ট আলো ছিল না। বা, যে-আলো মধ্যরাত্রির অন্ধকার থেকেও বিচ্ছুরিত হয়, সে-আলো ঐ দুটি বিশাল নয়নের প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতাকে নিঃশেষ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেই প্রবীণা, সেই বহুপ্রসবিনী প্রবীণা, সেই সদ্যোজাতকে শুধু কাঁদাচ্ছিলেন। তখন মধ্যরাত। সেই সদ্যোজাতকে তিনি কাঁদাচ্ছিলেন, আর সে যতই এক অনিশ্চিত কান্নায় ডুকরে উঠছিল, তিনি ততই এক নিশ্চিত হাসিতে উচ্চকিত হয়ে উঠছিলেন। আরো অনেকেই নিশ্চয়ই হাসছিলেন। হুলুধ্বনি উঠছিল, একজন শুরু করছিলেন, অন্য নারীরা একে-একে অনুসরণ করতে-করতে একটা সম্মেলক রচনা করে তুলছিলেন। সে হুলুধ্বনি থেমে যাবার পরও, হঠাৎ কেউ যেন ভুলে গিয়ে একা-একা উলু দিয়ে ওঠে। উল্লাস, উল্লাস, জন্মের উল্লাস। আর এক বড় দুর্বল কান্না, জন্মের কান্না। পুত্রমুখদর্শন। সূর্য তখন সেই মধ্যরাত্রিতে অন্য গোলার্ধের আকাশের কোন রাশিতে আর কোন লগ্নে অবস্থান করছিলেন? কী প্রগাঢ় ও মহৎ মানবজন্ম! সে মানবজন্ম

মাপা হয় সূর্য দিয়ে, গ্রহরাজি দিয়ে, আহ্নিকগতি দিয়ে। এ জন্ম ছিল সেই জাতকের যার বাল্য ও গোষ্ঠ থেকে অসূর্যের দিকে যাত্রা আমাদের দেখে যেতে হবে। সেদিনের মধ্যরাত্রির জন্মোল্লাসেই নিহিত ছিল কি চার দশক পরে তার আত্মহননের হাহাকার? কার কাছে আমার জিজ্ঞাসা? যে-মানব আমার কাছে ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে গেল, সেই মানবের ভিতর দিয়ে আমার যাত্রা ক্রমেই পান্থহীন হয়ে পড়েছে। বোধহয়, আরো বেশি এই কারণে সেই মানবপথ কোনো এক ভবিষ্যের নিশানা রাখতে চেয়েছিল, যে-ভবিষ্য হারিয়ে গেছে। অদৃশ্য নিসর্গে দেবতাদের সংসর্গে আমার আনন্দবৃক্ষ এক অতল খাদের ওপর ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। জন্মের মধ্যরাতে।

বত্রিশ

হাওয়ার কি দিনরাত আছে? রাত্রির হাওয়ায় কি শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষ লেগে থাকে? রাত্রিতে আলো প্রতি যামে যে-রহস্যময় পাল্টায় আকাশপটে আর মাটিতে তার যে আভা বদলাতে থাকে, তা কি হাওয়াতে লেগে থাকে? সেই রহস্য আর আভা? সে-রাতেও লেগেছিল, সে-রাতের মধ্যযামে?

আঁতুড়ে তো সবাইকে ঢুকতে দেয় না, তার অনেক বাছবিচার আছে। যাঁরা সেদিন আমাকে ঘিরে ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকে অনেকবার গর্ভ ধরেছেন, প্রতিবারই গর্ভ রক্ষা করেছেন ও প্রতিবারই গর্ভের শেষে তাঁদের সন্তান হয়েছে। সেই সুপ্রসবিনীরা তাকে কতকগুলো পুরনো কাপড়ের ভিতর রেখে সবার আগে আমারই চোখের সামনে মেলে ধরেছিলেন। আমি একবার চোখ মেলে শুধু দেখেছিলাম, মাথাভর্তি থোকা-থোকা চুল। আমারই শরীরের ভিতর থেকে যে ও এই কয়েকমিনিট আগে নিষ্ক্রান্ত হল, সেটা আর তখন তত বিস্ময়ের ও অবিশ্বাসের ছিল না, শরীরটা এমনই এলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার পেটের ভিতরে সে যে বড় হচ্ছিল, তখন তার চুল পর্যন্ত গজাচ্ছিল, এমনই চুল, এমনই থোকা-থোকা গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল? সেই চুলটুকু দেখেই আমার সব কিছু কেমন বদলে গেল। কে বলে, পেটে বাচ্চা এলে মেয়েরা বদলায়? মেয়েরা একেবারে সবটুকু বদলে যায় পেট থেকে বাচ্চা বেরলে। ঐ ছোট্ট মাথায় এক কোঁকড়া থোকা-থোকা চুল থেকে আলো ঠিকরচ্ছিল। গলার যে-স্বরটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু তুলে আমি বলে উঠেছিলাম—'ওদের দেখাও, ওদের।' কাদের কথা বলেছিলাম আমি তখন? বাইরে যারা অপেক্ষমাণ ছিল,

তাদের কথা? না, আমার পুরুষের কথা? না, আকাশের কালপুরুষের কথা? না, রাত্রির লুপ্ত দিগন্তের কথা? না, রাত্রির অন্ধকারের কথা? আমি কথাটুকু বলে চোখ বুজেছিলাম কিন্তু চোখ বন্ধ করলেও যে-দৃশ্য দেখা যায়, সেই দৃশ্য জুড়ে ছিল কাল কুঞ্চিত কেশদাম, যা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। এখন তাহলে সেই সময় এল, যখন, যা কিছুতে আমরা বসবাস করেছি ও যা কিছু আমাদের ভিতরে বসবাস করেছে, সেই সবের ভিতর থেকে দেবতারা হেঁটে বেরিয়ে পড়বেন। আর, তারপর আমার এই আবাসনের অভ্যন্তরীণ সব দেয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। এমন এক বদলে যে-হাওয়া উঠবে, তাতে, কোদালে কোপানো মাটির চাঙার যেমন উঠে আসে, সময়ের সে-রকম সব চাঙার উঠে আসবে। তখন বাতাস নতুন বইবে। যে-বাতাস আগে কখনো বয়নি, এমনই অভূতপূর্ব এক বাতাস বইবে। আমাদের রোজকার ছোঁয়া লাগে এমন সব কিছুতেই দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন, এই সব ক্ষণে তাঁরা আনন্দময় জেগে ওঠেন আর যে-কূপ আমরা মনে-মনে তলহীন খনন করে যাই, সেই কুয়োর জলে তাঁদের মুখচোখ ধুয়ে এই আমাদের চারপাশের সব কিছুর ভিতর দিয়ে এক অবকাশ ছড়িয়ে দেন। যা পূর্ণ ছিল, তা পূর্ণ থাকে, আমাদের জীবন টইটম্বুর হয়ে ওঠে। পূর্ণ থেকে যদি কিছু তুলে নেয়া হয়, তাহলেও সে পূর্ণ থাকে। সে কী পূর্ণতা! পুনরুক্তি অসাধ্য সেই পূর্ণতা। তোর ঐটুকু মাথার অমন থোকা-থোকা কাল চুলে আঁতুড়ঘরের ঐ এক ছোট্ট আলোর বৃত্তে সেই মধ্যরাত্রিতে ঐ পূর্ণকে দেখেই তো আমার চোখ বুজে এসেছিল। তোকে দশমাস দশদিন পেটে ধরতে পারি, হ্যাঁ, আমি পূর্ণগর্ভা, আমি নির্দিষ্ট সময়ের পুরোটা জুড়ে গর্ভ তৈরি করেছি ও তারপর আমার শরীর দিয়েই আমার সন্তানের জন্ম দিয়েছি। আমার বুকের বোঁটা ফুলে উঠতে শুরু করেছিল, তখনই, তন্মুহূর্তে। তোকে দশমাস দশ দিন পেটে ধরতে পারি, তোকে নিজের শরীর থেকে নিষ্ক্রমণ করাতে পারি, কিন্তু তোর ঐ নতুন মাথার থোকা-থোকা চুলে এক নিবু-নিবু আলোর বিচ্ছুরণ আমি সইতে পারছিলাম না। কাউকে সে-কথা তখন আমি বলিনি। বলা তো দূরের কথা, নিজেও ভাবিনি। এ-সব তো এখনকার সব ভাবনা, বাতাসের ঘূর্ণিতে যা চিহ্নহীন লুপ্ত হয়ে যাবে। সোনা, ওরা যখন সেই প্রবাসে তোকে তোর চিতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখনো কি তোর ঘাড় উপচনো কোঁকড়া কাল চুলে আলো ছলকে যাচ্ছিল। সে তো চার দশক পরের কথা। সে-পূর্ণ দিয়ে আমি কী করব, যা আমার সন্তানের আত্মহননেও শূন্য হয়ে যায় না? তোর এই সারা জীবনটাকে তোর জন্মমুহূর্তেই দেখে ফেলে আঁতুড়-জাগানি সেই বহুপ্রসূতিদের কেউ বলে উঠেছিলেন,

'সইবে, সইবে, সবই সইবে, কোমরে ঘুনসি উঠবে, মাথায় চুড়ো উঠবে, ছেলে গোষ্ঠে যাবে, সইবে, সইবে'।

তেত্রিশ

বাতাসে, ঘূর্ণিবাতাসে, যে-ধ্বনি এসে পৌঁছয়, কেউ জানে না সেটা কোনো এমন ধ্বনি কীনা যা প্রতিধ্বনি চাইছে, অথবা সেটাই এক প্রতিধ্বনি, যেখানে ধ্বনি শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই এক ইচ্ছে, জাগবার আগে যদি তা জানা যেত !

আমি এখন তোর বাল্য দেখতে চাই, বাতাসে আকাশেব যে-মেঘ স্রোতের দ্রুততায় নিজের আকার বদলায়, সেই মেঘে। আমি এখন তোর বাল্যের কথা বলতে চাই, স্বপ্নে মানুষ যেমন এক অনুপস্থিত শ্রোতাকে কোনো এমন অবাস্তব কাহিনী বলে, তেমনি স্বরে। সে-স্বরে সম্ভাষণ আছে, কথন আছে কিন্তু কোনো প্রতিভাষণের প্রতীক্ষা নেই, কোনো উত্তরের প্রয়োজন নেই। বাতাসেরও মানচিত্র আছে। বাতাসই নিজের মানচিত্রের বিষুব, কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তিকে বদলে-বদলে দেয়। বাতাসে, এমন ঘূর্ণিবাতাসে যদি আমি তোব বাল্যখণ্ডের কথাগুলি বলতে থাকি, তা কারো কাছে পৌঁছুবে না, কারো উদ্দেশ্যে বলা হবে না, নিজের আবর্তনে বাতাস সে-কথাগুলিকে নিজের ভিতরে গোপন করে রেখে কোনো এক বর্ষণের সময় কোনো এক খরাপ্রান্তরে ঝরিয়ে দেবে, হারিযে দেবে। মেঘের মায়ায় তোর বাল্য দেখা, আর বাতাসের ঘূর্ণিতে তোর বাল্যখণ্ড গেয়ে যাওয়া—এ-সবের তো একটাই মানে। স্বপ্নে মানুষ যখন কথা বলে উঠতে চায়, তখন সে-স্বপ্নে শ্রোতাও থাকে কিন্তু অনেক সময়ই তো সে-স্বপ্নে কথা ফোটে না। কথার বদলে কেমন একটা গোঙানি বেরয়, শ্বাসরুদ্ধ গোঙানি। সোনা, আমার প্রাণ, তোর শ্বাসনালী তুই নিজে বন্ধ করে দিতে পেরেছিলি, তারপরেও আমি দিনের পর দিন শ্বাস নিয়ে যাচ্ছি। স্বপ্নে নিজের শ্বাস নিজে রুদ্ধ করতে চাই। তোর বাল্যখণ্ডের গান আমার সেই গোঙানি। আর, আকাশের মেঘের আকারবদলে তোর বাল্যদর্শন আসলে আমার মনে-মনে তোর বাল্যকে গড়ে তোলা আর ভেঙে ফেলা আর গড়ে তোলা। আমি বেশিদূর এগতে পারব না। ঐ তুই যখন গোষ্ঠে যাবি, বাড়ির বাইরে প্রথম পা দিবি, বড়জোর সেই পর্যন্ত। সন্দেহ হয়,তাও কি পারব ? যদি না-পারি, পারব না। যদি পারি, ঐটেই আমার সীমা—সেটা অতিক্রমের অধিকার, বা সাহস, আমার এখনো নেই। সে তো তোর প্রবাস। তোর প্রবাস, আমি জানব কী করে ? যতদিন বাঁচব, কল্পনা করতে পারব, আকাশের মেঘে

বপ্রক্রীড়া রচনা করে যেতে পারব, কেউ শুনতে পাবে না এমন উচ্চারণ ঘূর্ণিবায়ুর কাছে করতে পারব, ঘূর্ণিবায়ুর আলোড়ন, পথহীন আলোড়ন, নিজেকে ঘিরে নিজের আলোড়ন বহন করতে পারব, নিজের ভিতরে সেই ঘূর্ণিবায়ুকে উৎক্ষিপ্ত করে তোলার ক্ষমতা যতদিন থাকবে, ততদিন, ততদিন, প্রাণাধিক আমার, তোর প্রবাসে প্রবেশের চেষ্টা আমি করে যাব। তোর আত্মহননের কাছে আমার আত্মজীবনের এই প্রতিশ্রুতি। সে-প্রবাস এখনো দুর্ভেদ্য দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ও আমার আত্মঘ্ন আত্মজ, আমি তোর কাছে আরো কিছু আয়ু চাই—কামার্ত পিতা শান্তনু বা যযাতির মত নয় —আরো যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ও মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত, এক সৈনিকের মত। আমি ঐ প্রবাসের দেয়াল ভাঙব। কিন্তু তার আগে, আমার স্মৃতির একটু গোপন শুশ্রূষা প্রয়োজন। তোর গোষ্ঠ একবার দেখি, আকাশের মেঘে; তোর গোষ্ঠ একবার গাই, ঘূর্ণিবাত্যায়। এমন নয় যে তোকে বড় হতে দিতে চাই না, এখনো, যখন বড় হওয়ার মত কোনো বর্ষে তোর আর প্রবেশ নেই। এমন নয় যে তোর বড় হয়ে ওঠার ভিতরে, সহসা, সাবালকতার অবিস্মরণীয় কোনো দোষ আমি ভাগ করে নিতে চাই, এখন সহসা সবার সামাজিক বিবেকের সঙ্গে আমি কোনো আপোশ করে নিতে চাই, যেন, সন্দেহের বশে আদালত থেকে সমন নিয়ে কোনো হুকুমবরদার এসেছে ও সে আমাকেও তোর কোনো এক অতীতের হাজতে পুরে দেবে। সে-হাজতে অতীত নেই, আছে অতীতের বর্জ্য। সে-হাজতে ভবিষ্যৎ একটিমাত্র নালা দিয়ে শরীরের বর্জ্য তরলের মত বেরিয়ে যায়। আর হেফাজতে রাখা লোকটি, সেই তরল নিজের মাথায় মাখতে-মাখতে ভাবে, কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু আর-একটা হাজতও তো আছে, যা আমাদের শ্বাসবায়ু দিয়ে রচিত, বড় বেশি আগে বুঝে ফেলা কোনো আশা দিয়ে রচিত, আমাদের নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্মাণ। সে-দেয়াল, সে-হাজতটাকে আমাকে চিনে নিতে দে। আমাকে আর-একটু আয়ু দে। যে-সময় পর্যন্ত পৌঁছুতে তুই অস্বীকার করলি, সেই অনতিবাহিত সময় থেকে আমাকে একটু আয়ু দে। আমি তোর প্রবাসের দেয়ালটার প্রতি বর্গ মিলিমিটারের মানচিত্র যাতে ছকে নিতে পারি, আক্রমক যে-সূক্ষ্মতায় তার লক্ষ ও পথ ছকে নেয়, আমার সমস্ত আয়ুধে যাতে আমি শান দিয়ে নিতে পারি, আমার সমস্ত বর্ম থেকে আমি যাতে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারি, আমার রথকে যাতে আমি অশ্বমুক্ত, ও অশ্বকে যাতে আমি বল্গামুক্ত করে দিতে পারি। তারপর, কণামাত্র আত্মরক্ষা অবশিষ্ট না রেখে তোর প্রবাসের সেই দেয়ালের ওপর আমার প্রস্তুত, পরাক্রান্ত ও অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ ঘটবে। সে-দেয়াল ভাঙবে আর আমি চাই সেই

দেয়ালের ভগ্নস্তূপের ভিতর, প্রাণ আমার, আমার নিশ্বাসরিক্ত দেহ, বায়ুভূত তুই গ্রহণ করবি। তখন, তখন তুই মিলিয়ে নিস, খরাহীন দেশের যে-টকটকে ফুলের মালা মেয়েরা তাদের প্রেমের তুঙ্গমুহূর্তে গলায় দোলায়, আমার বুকেও ভালবাসার সে-ই ফুলমালাই ছিল, কিন্তু আমারই বুকের রক্তে তা এমনই কালচে লাল হয়ে উঠেছে যে আকাশের শকুন সেই মালাকে আমার হৃদপিণ্ড মনে করে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে। কিন্তু তার আগে, এখন, এখন, একবার তোর গোষ্ঠ দেখি। তার আগে তোর সেই শুয়ে থাকা দেখি, যখন তুই পাশ ফিরতেও পারতি না। যে-শৈশব তুই পেরসনি তখনো, সেই শৈশবের কোনো ফাঁক দিয়ে তুই তো আর-একটা শৈশবও দেখে ফেলেছিলি, আমরা তোকে যে-রূপকথা শোনাতাম, তার চাইতে অনেক আলাদা। তোকে আবার সেই শৈশবে, বাল্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, যখন এমন সব দৃশ্য তুই দেখতে পাবি, যা আর-সবার কাছে অদৃশ্য। তোর সেই শৈশব-বাল্যের, গোষ্ঠের একই মুখের মুখমালা, একই তনুর তরুমালা। একই মানুষের একমুখ থেকে মুখান্তরে দশক, শতাব্দ ও সহস্রাব্দ পেরিয়ে যায়। সেই শৈশবে, সেই বাল্যে, সেই গোষ্ঠে তুই দেবপুত্রদের মত বিচরণ কর। তুই বিস্মৃত সব নদীর পুনরুদ্ধার ঘটা। যে-স্রোত মরে গিয়েছে, সে-স্রোত বেঁচে উঠুক, আবার। তোর দশদিকে আকাশ পুঞ্জিত হয়ে উঠুক। কোন সম্বোধন, কোথায় এসে দাঁড়াল। কোন উচ্চারণ, কোন উচ্চারণ জাগিয়ে তুলল। কোনো ধ্বনিও যেখানে রণিত হয়নি, সেখানে এত প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠল কেন দশদিক। আমি তোর শৈশব দেখি, প্রাণ, তোর বাল্য দেখি, আর তুই কেমন করে এই ধেনুদলকে চারণে নিয়ে আর ফিরে আসিস না, দেখি।

চৌত্রিশ

ঘূর্ণিবাতাস নিজের একটা কেন্দ্রকে পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। আর সেই পাকচক্র নিয়েই সে সম্প্রসারিত হতে-হতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যতক্ষণ, তার সেই কেন্দ্র মিলিয়ে না যায়। ঘূর্ণির এই কেন্দ্র স্থিত হোক, গতিমান হোক ও আবর্তিত হোক।

শোকে যদি আমি আর্তিতে আকাশ ভরিয়ে দিতাম, তাহলে দেবদূতের মত কেউ এসে আমাকে বুকে আশ্রয় দিতে পারত। কিন্তু তাতেও তো আমি শিউরে উঠতাম। যে-ত্রাস আমরা সইতে শুরু করেছি, তাই-ই তো সুন্দরে গিয়ে শেষ হয়, বা আর-এক শুরু ঘটে সেখান থেকেই। সব সুন্দরই এক

ত্রাস। তুইও আমার ত্রাস। তুইও আমার সুন্দর। তুই আমাকে ধ্বংস করবি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে না-পারাটা সত্যি একটু অদ্ভুত। ফুল দেখে বা অন্য কিছু দেখে মানুষের ভাগ্য বলতে না-পারাটাও কত অদ্ভুত। আসলে, কত কিছুই তো আমাদের রপ্ত হয়ে যায়। বাঁচতে-বাঁচতে। যা ছিলাম, তা আর না-থাকতে পারা। আর নিজের ডাকনামটা, বাচ্চাদের ভুলে যাওয়া খেলনার মত, ফেলে যাওয়া ! সম্ভাষণগুলো থেমে যাওয়া ! সম্বন্ধগুলো বাতাসে এলোমেলো ভাসতে-ভাসতে পড়ে যায়। চলে যায়। খসে যায়। অনন্তের কিছু একটু বুঝে ওঠার আগেই মরে যাওয়া ! বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়াব ভিতর যেন বড় বেশি তফাৎ তৈরি করে তোলা হয়েছে। যারা বেঁচে থাকে, আমার মত, পিপাসু নেই অথচ পূর্ণস্তন্য নিয়ে, তারাই এ তফাৎ বানায়। দেবদূতরা কি জানেন, তাঁরা কোথায় সঞ্চরণ করেন, জীবিতদের মধ্যে, নাকী, মৃতদের মধ্যে ? অনন্ত ঘূর্ণি চিরকাল ধরে সূর্যলোক ও অসূর্যলোক ঘিরে কী তীব্র বেগে ঘুরে চলেছে, তার কোনো বিরতি নেই। আর, দেবতাদের স্বর জীবিত ও মৃত সবার স্বরকে ঢেকে ফেলে উত্থিত ও আবর্তিত হয়েই চলেছে। এই বিন্যাসটুকু আমার পক্ষে যদি অক্ষয় হত, আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু আমার গর্ভের সন্তান যে মৃতলোকে, সে আমার স্তন্যপান করেছে, আর আমি যে এখনো বেঁচে—আমি সেই দেবতাদের বা তাদের দূতদের নিয়ে কী করব, যাদের কাছে জন্মমৃত্যু সমান ?



সন্তানলোক

এক

পৃথিবীর সব শিশুই জন্মের পর একই ভাবে শোয়, একই ভাবে জাগে, একই ভাবে একটু-আধটু হাত নাড়ায় বা পা নাড়ায়। অথচ সব শিশুই যেন পৃথিবীর প্রথম শিশু। তার আগে যেন এ পৃথিবীতে আর-কোনো শিশু জন্মায়নি, আর-কোনো শিশু ঘুমোয়নি, আর-কোনো শিশু পাদুটো হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে হাঁটুটা দুদিকে ছড়িয়ে দেয়নি, আর-কোনো শিশু দুই হাত নিজের দুই কানের পাশে চিত করে রাখেনি, আর-কোনো শিশুর হাতের আঙুলগুলি এমন বেঁকে থাকেনি, আর-কোনো শিশু কেঁদে উঠে ঘুমের ভিতর থেকে জেগে আবার ঘুমের ভিতর ফিরে যায়নি।

দুই

যেমন সবার থাকে, ওরও তেমনি মাথা তেলে ভিজিয়ে রাখা। কী-এক তেলের ভিতর সরষে দিয়ে, সেই তেল গরম করে, সেই গরম ঠাণ্ডা করে, একটি কাঠির মাথায় মোটা করে তুলো পেঁচিয়ে, ওর মাথার চুল এমন ভিজিয়ে দেয়া হত, যাতে সেই তেল মাথার খুলি পর্যন্ত যায়। ওকে নিয়ে যা কিছু করা হয়, তাই যেন একটা ব্রতের আচার-অনুষ্ঠান করার মত। কী কী করতে হবে, সব যেন বহুকাল আগে থেকে ঠিক করে রাখা আছে। তোমাকে সেই আচারগুলো পালন করতে হবে। সবটুকু মন দিয়ে, সবটুকু শরীর দিয়ে পালন না করলে সে ব্রত সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। আজকালকার ডাক্তাররা অবিশ্যি এ-সব মানে না, বলে দেয়, তেল-ফেল কিছু লাগাবেন না, ওতে চামড়ায় ইরাপশন হয়, আর মাথায় তেল দিয়ে কী হয়? কী হয়, তা কে জানে? কিন্তু ডাক্তারবাবু তাঁর ছেলের মাথায় তেল দিতে দেননি? কী হয়, তার জবাব কে কাকে দেবে, কিন্তু কিছু না-হলে কি এত যুগ ধরে এই একই নিয়ম চলে আসছে? যা উঠে যাওয়ার, তাতো উঠেই যায়। তাকে আর ঠেকিয়ে রাখবে কে? এখন কি আঁতুড়ঘরে রাতজাগা হয়, এখন কি আতুড়ঘরের দরজায় ব্রাহ্মণকে শুয়ে থাকতে হয়, এখন কি জন্মের পর ষষ্ঠরাতে ষষ্ঠী ঠাকরুন বাচ্চার কপালে নিয়তি লিখতে আসেন, এখন কি আর কেউ অশৌচ ভেঙে আঁতুড় থেকে বেরয়? আঁতুড়ই নেই, তার আবার অশৌচ? এখন হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের লেবার রুমই তো আঁতুড় ঘর। খুব বেশিদিন যে এটা হয়েছে, তা অবিশ্যি নয়। আর এখনো নার্সিং হোম বা হাসপাতাল থেকে ফিরলে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কিছু-কিছু আচার-অনুষ্ঠান করতে হয়। ছেলে নিয়ে দাঁড়াতে হয়, তালপাতার পাখাতে দুব্বোঘাস চেপে তার বাতাস দেয়া হয় ছেলে আর ছেলের মাকে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছেলের মাকে সন্তান তুলে দিতে হয়, যেন কার কোলে। এ আমার, এ তোমাদের সবার হোক। তালপাতার পাখাই আজকাল দুর্লভ, হয়তো দুব্বোঘাস আরো দুর্লভ। কোলে নেয়ার জন্যে কেউ থাকে, চৌকাঠের ভিতর দিকে? না-ই থাকল। তাহলে মা নিজেই চৌকাঠের গোড়ায় দাঁড়াবে। পাখা না থাকলে, আঁচলের বাতাস দিয়ে দ্বারপথ থেকে অমঙ্গল দূর করবে। এই দ্বারপথে সে প্রথম প্রবেশ করছে, সব অমঙ্গল দূর হোক। তারপর নিজেই ছেলে কোলে করে চৌকাঠ ডিঙোবে—'এই আমি আমার সন্তান নিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকলাম, এ আমার সন্তান।' তারপর নিজেই চৌকাঠ ডিঙিয়ে, ভিতরে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বাহিরের উদ্দেশ্যে সন্তানকে তুলে

ধরে বলবে, 'এ আমার, এ তোমাদের সবার হোক।' তাতে অর্থটা কোথায় বদলে যায়। তবে, অর্থ তো একটা তৈরিও হয়। ব্রত বদলায়, আবার বদলায়ও না।

তিন

ওর জন্যে সব আয়োজনেই এমন ব্রত লেগে থাকে। যে-ছোট্ট একটুখানি স্টিলেব বাটিতে এক কর ডোবে এমন তেল গরম করতে হয়, সে তো বাটির তলায কাগজ পোড়ালেই গরম হয়ে ওঠে। উঠলেও, সে কি করা যায় ? খবরের কাগজ, ফেলে দেয়া কাগজ দিয়ে সদ্যোজাতের মাথায় দেয়ার তেল গরম করা —এর চাইতে অলক্ষ্মীর কাজ আর কী হতে পারে। এমন আগুন তোমাকে জ্বালাতে হবে, যে-আগুন কেউ সংগ্রহ করে এনেছে, কেউ জ্বালিয়ে রেখেছে, যে-আগুনের পেছনে তোমার আগের কোনো মানুষ তার মন দিয়েছে ও ঘাম দিয়েছে। এক হতে পারে, বড় প্রদীপের আলো, এমন প্রদীপ যার শিখা দীপ্যমান হয়ে অন্ধকার দূর করে। করে এসেছে। করে আসছে। সে একটা প্রাণবান প্রদীপ হতে হবে। তার গায়ে দূর-করা অনেক অন্ধকারের গাদ লেগে থাকবে। আর, তার শিখাতে আগুন ছোঁয়ালেই পোড়া সলতের ধোঁয়ায় ঘর ভরে যাবে, তারপর আগুন জ্বলবে, প্রথমে খুবই ক্ষীণ, তারপর সেই সলতের তেলেভেজা মোটা অংশটা চিরস্থায়ী আগুনের মত জ্বলে উঠবে। সে-শিখা দেখে যেন আগুন কথাটি মনে না আসে, সে শিখা দেখে যেন দীপন কথাটি মনে রণিত হয়। আগুন তো পোড়ায়, এ-আগুন তো জাগায়। এবার আঁচলেরও প্রান্তটুকু দিয়ে ঐ সরষে-ছেটানো তেলের বাটিটা সেই শিখার ওপরে ধরে থাকতে হবে। ধীরে-ধীরে ধীরে-ধীরে বাটিটা গরম হয়ে উঠবে, তেলে শাদা-শাদা দুটো-একটা বুদবুদ দেখা দেবে। কতটা গরম করবে ? কখন নামাবে ? এর কোনো হিশেব নেই। যার বোঝার সে ঠিক বুঝে যায়, এবার বাটিটা নামাতে হবে। কানে আসে কী আসে না, এমন একটা আওয়াজ তেলে ফুটতেও পারে, নাও পারে। বাটিটা নামাবে কোথায় ? যখন বোঝা যাবে, আঁচলের প্রান্তের ভাঁজ ভেদ করে তাপ তোমার আঙুলে লাগছে, তখন, সেই আঁচলের প্রান্ত মাটিতে বিছিয়ে তেলের বাটিটা রাখবে। এবার গরম তেল ঠাণ্ডা হবে। আচার তো বদলে যায়। আচার তো কেউ-কেউ মানতেও চায় না। কিন্তু আচার যে তৈরিও হয়।

চার

অথবা, পাটের আগুন জ্বালানো যেতে পারে। পাটকাঠির নয়—তেমন হঠাৎ-জ্বলা, হঠাৎ-নেবা আগুনে তেল বেশি গরম হয়ে যেতে পারে, বেশি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যেতে পারে। এলানো শুকনো পাট দড়ির মত পাকিয়ে নিতে হয়, চুলের যেমন বেণী পাকায়। তারপর, সেই বেণীর গোড়ায় আগুন ধরতে হয়। ধরতে একটু সময় নেয়। চিড়বিড় করে স্ফুলিঙ্গের মত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে-যেতেই পাটের পাকে আগুন পৌঁছে যায়। তখন আগুনটাকে ওখানে নিভতে দিতে হয়। এ তো দীপের আলো নয়, এ আগুন, আগুন জ্বালাবার আগুন, জ্বলবার আগুন। সেই কবে বর্ষার আগের হিশেব ছাড়া জলে মাটি ভিজে উঠলে পাট গাড়া হয়েছিল। তারপর বাতাস দক্ষিণ থেকে পুবে গিয়েছে। মেঘ সে-বাতাসের ধাক্কায় পশ্চিম-উত্তর কোণে গিয়ে জমা হয়েছে। সেই ঝড়ে-জলে আলোয় অন্ধকারে পাটখেতে জল জমেছে, যত জল জমেছে, পাট তত বেড়ে উঠেছে। যত ঝড় উঠেছে, পাট তত বেড়ে উঠেছে। বর্ষার পর পচা গরমে সেই পাটগাছ কেটে বর্ষার আটকে থাকা জলে, ডোবায়, খানায়, খালে, খন্দে, নয়ানজুলিতে ভেজানো হয়। পচিয়ে-পচিয়ে পাটের ছাল আলগা করে ফেলা হয়। তারপর জলের ওপর আছড়িয়ে-আছড়িয়ে সেই ছাল ছাড়িয়ে ভিতর থেকে বের করে পাট শুকোতে দেয়া হয়। কতগুলি রোদজল, বর্ষাবাদল, আলো-অন্ধকার এই পাটখেতের ওপর দিয়ে যাওয়ার পর, তবে এই এক গোছা পাট বেণী পাকিয়ে আগুন জ্বালাবার মত ও আগুন ধরে রাখার মত, দাহ্য ও দৃঢ় হয়েছে। কত দিনের কত মানুষের কতটা শ্রম তোমার সদ্যোজাত সন্তানের তেলটুকু গরম করার জন্যে আগুন হয়ে উঠেছে। সেই আগুনের মুখে ঐ আঁচলের প্রান্তে চেপে বাটিটা ধরতে হবে। সে-ই, তেলে শাদা-শাদা বুদবুদ দু-একটা দেখা দেবে। একটু তেল গরম হওয়ার আওয়াজ কানে আসবে, কী আসবে না। আঁচলের প্রান্তরে না ভাঁজের ভিতর থেকে তাপ তোমার আঙুল পর্যন্ত পৌঁছুবে। তুমি সেই আঁচলের অন্য প্রান্ত বিছিয়ে তার ওপর বাটিটা রেখে দিও। এবার তেল ঠাণ্ডা হোক। আর, এ-আগুন নেবাতে নেই। কোথাও গুটিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, যার দরকার সে যেন আগুন পায়। আর, না-হলে আগুন আপন মনে নিবে যেতেও পারে। যে-আগুন তুমি জ্বালিয়েছিলে, তোমার সন্তানের প্রয়োজনে, সে-আগুনকে তুমি রক্ষা করবে, নেবাবে না।

পাঁচ

সেই তপ্ত তেল ধীরে-ধীরে ধীরে-ধীরে আবার ঠাণ্ডা হবে। কতটা ঠাণ্ডা হল, শিশুর মাথায় সইবে কী না এ-সব মাপার কোনো যন্ত্র নেই। এগুলো জানা যায়, টের পাওয়া যায়। তোমার আঁচলের প্রান্ত দুটি তো একটু গরম হয়েই ছিল, এখন, যে-প্রান্তের ওপর বাটিটা রেখেছে, সেটা আরো একটু তপ্ত হবে ও তারপর ঠাণ্ডা হতে শুরু করবে। তোমার আঁচল যখন তোমার হাতের পিঠে আর গরম লাগবে না, একেবারেই না, তখন বুঝবে বাটির ভিতরের তেল এতটাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, যে, তোমার সন্তানের মাথায় একটুও তাপ লাগবে না। এটা বোঝার জন্যে তোমার মনের সবটুকু ঐ আগুন আর তেল আর তাপের ওপর রাখতে হবে। এটা বোঝার জন্যে তোমার হাতের আঙুলের মাথা আর হাতেব পিঠকে কতটা নির্মল, স্পর্শবহ করে রাখতে হবে!

ছয়

ও কোলে শুয়ে থাকে। আর তুলো দিয়ে মোড়া কাঠির মাথা দিয়ে ওর মাথাব চুলে খুব ধীরে-ধীরে ঐ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া গরম তেল লাগিয়ে দিতে হয়। সেই তুলির মাথায় কখনো যদি দুটি-একটি সরষের দানা উঠে আসে, তবে বাটির কানায় তুলিটা ঘষে সেই সরষের দানা সরিয়ে দিতে হয়। তাতে তেলও কিছুটা গড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর মাথার খুলিও তখন এত নরম যে সেখানে সবষের দানা টানলে কেটে যাবে। যাকে ব্রহ্মতালু বলে, সেখানে একটা খুব ছোট চৌকো কাপড়ের টুকরো সেঁটে দেয়া থাকে। তেলে ভিজে সেটা ওর মাথায় আটকে থাকে। সেই পাতলা কাপড় তেলে ভিজে আরো পাতলা হয়, আর সেটা ভেদ করে ওর ব্রহ্মতালুর স্পন্দন বাইরে থেকে দেখা যায়। হৃদপিণ্ডের মত সতাল স্পন্দিত হতে থাকে সেই ব্রহ্মতালু। বরং হৃদপিণ্ডের চাইতেও সতাল। ও যখন চিত হয়ে শুয়ে থাকে তখনো ওর বুকের স্পন্দন অতটা স্পষ্ট করে সব সময় বোঝা যায় না। হাত বা পা একটু নাড়ালে স্পন্দনের জায়গাটাও যেন একটু বদলায়। তখন ঐটুকু বুকের ওপর বিশাল করতল দিয়ে বক্ষস্পন্দন অনুমান করতে হয়। তবে, বুকের চাইতে বেশি দোলে পেট। ওর বুকের ওপর খুব পাতলা একটা কাপড় থাকে, যাতে ওর অনভ্যস্ত ত্বকে আলো আর হাওয়া সরাসরি এসে না লাগে। আর, কোনো কারণে যাতে চমকে না ওঠে সেই জন্যে ওর পেটের ওপর একটা খুব পাতলা বালিশ দেয়া থাকে। পাশ থেকেও বালিশের চাপ থাকে। পৃথিবীর সব শিশুই

তো পৃথিবীর প্রথম শিশু। ও যতদিন নিজে না বোঝে, ততদিন ওকে বুঝতে দিতে নেই যে ও গর্ভের বাইরে এসেছে। ও যেন বোঝে, আর-একটা মানব শরীর ওকে ঘিরে আছে, ও একেবারে মানবশরীরের একটা ভিতরের অঙ্গ হয়ে বেড়ে উঠছে, নিজের স্বতন্ত্র হৃৎপিণ্ড ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্তসংবহন নিয়ে। কিন্তু ও কেমন করে বুঝবে যে ও এতই সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র? মানবশরীরের ভিতরের উষ্ণতা মানুষ নিজেও শরীরের বাইরে থেকে অনুমান করতে পারে না, সেই উষ্ণতা পেয়ে যে সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র হল, তাকে গর্ভের বাইরে এত স্বাধীন আলো-হাওয়ায় কি ছেড়ে দেয়া যায়? ও যখন চার দশক পরে অসূর্যের দেশে ঢুকে পড়বে, তখন কি ওর এই গর্ভস্পর্শটুকুরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল?

সাত

ও কেঁদে উঠত নানারকম। ঘুম ছাড়া তো ওর আর-কোনো কাজ ছিল না। খাওয়া এক ধরণের কাজ বটে, সে তো চাইবার আগেই জুটত। আর মলমূত্রত্যাগও কোনো এমন সচেতন কাজ নয় যাতে ওর ঘুম ভাঙতে হবে। ঘুমটাও কি তেমন কোনো কাজ? ও তো আর ঘুমুতে চেয়ে ঘুমত না। ও তো ঘুমিয়েই থাকে। সেই ঘুমের যদি কোনো বিঘ্ন ঘটে বিছানা ভিজে যাওয়ায়, বা খিদে পাওয়ায়, তাহলে কেঁদে উঠত। সে-কান্নার কত রকম! কখনো একটু ফুঁপিয়ে উঠে ঠোঁট ভেঙে যাওয়া—কোনো আওয়াজ বেরয় না। হাতটা বুকের ওপরে রাখলে, ওর পক্ষে যতটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা সম্ভব, ফেলে, কান্নাটা গুটিয়ে নিত। এগুলো বোধহয় ভিতরের কান্না। উপছে উঠে মিলিয়ে যায়। ওর শোয়ার চাদরে বারবার হাত দিয়ে তো দেখাই হয়। কখনো-সখনো দেখতে একটু দেরিও তো হতে পারে। তাতেই ওর ঘুম চিরে যায় আর চোখ না খুলেই ঘুম ভেঙে গলা দিয়ে কান্নার আওয়াজ তোলে। যেন, কত অভিমান। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে দুহাতে ওকে একটু তালে-তালে চাপড়ে দিলেই ঘুম আবার ঘুমের ভিতর তলিয়ে যেত। এ-সব ছল-কান্নার বাইরে সত্যি কান্নাও ছিল। পৃথিবীতে সব শিশুকে শুধু কান্নার ভাষা নিয়েই থাকতে হয়। তারপর তাকে ধীরে-ধীরে এই আলো ও হাওয়ার স্পর্শে কান্না ভুলতে হয়। যতদিন সে তা না জানে, না বোঝে, যতদিন কান্নায় তার একটা অধিকার থাকে, এমনকী কথা শেখার পরও যখন কান্নাই তার একমাত্র শেষ অবলম্বনের ভাষা থাকে, তখন কতই-না সহজ থাকে সেই কান্না। ওকে কি আবার সেই কান্নার ভাষা জানতে

হয়েছিল, ভোলা কান্নার ভাষা আবার ভিতর থেকে জাগাতে হয়েছিল, যখন, ওরই কত কান্না মুছিয়ে দেয়ার কথা? ততটাই পরিণত হয়ে যদি কাউকে ভাষার বর্ণপরিচয়ের উচ্চারণ ভুলে, কান্নার উচ্চারণে ফিরে যেতে হয়, তাহলে তাকে কতটাই আত্মঅবলম্বনহীন হয়ে পড়তে হয়, তাহলে তাকে কতটাই মূক হয়ে যেতে হয়। সাত সমুদ্র, তের নদী ও তিরিশ আকাশ পেরনো সেই কান্না পরিবহণের যন্ত্র থাকতে পারে, কিন্তু, সেই যন্ত্রের পিছনে তো একটা মানুষই কাঁদছে, একটা মানুষই আর্ত হয়ে পড়েছে। পশুর মতই? যে-পশু, এমনকী তার আক্রমণের ভাষা ও ভঙ্গিও হারিয়ে ফেলেছে, তার কান্না ছাড়া থাকেটা কী?

আট

খিদের কান্নারও ওর কত ধবণ। 'তোমরা কি সব ভুলে গেলে যে আমার খিদে পেয়েছে', এ-কথাটা কেউ মুখে না বলে চুপ করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, এ-কথাটা কেউ একটু অভিমান করেও বলতে পারে, সে হয়তো কথাটা শেষও করে না। এ-কথাটা খুব চটে উঠেও কেউ বলতে পারে। যেন ও এত ভাষাই জানে, ভাষার এত ভঙ্গিই জানে, স্বরের এত ভাঁজ জানে এমন করে কখনো হয়তো একটু ডুকরে উঠল। ওটুকুই। ওর বেশি নয়। কখনো হয়তো একটু জোরে একবার কেঁদে উঠে থেমে গেল। যেন ও জানে, কান্নাটা যার শোনার কথা, সে কান্না থেকে কত দূরে আছে। কখনো হয়তো এমন কান্না বেরিয়ে আসতেই থাকে। যেন ও বহুক্ষণ ধরে কান্না চাপছিল, আর পারল না। কখনো আবার প্রথম থেকেই গলা সপ্তমে চড়ল। যাঁরা অনেক সন্তানকে বুকের দুধ খাইয়ে বড় করে ভাতের থালার সামনে নিজে হাতে খাওয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরা বলতেন, 'নতুন পোয়াতির সময় তো ছেলের কান্না বুঝে-বুঝেই কেটে যায়।' পেটের ভিতরে তো আর ও কাঁদত না। তাহলে এত কান্না কাঁদতে শিখল কোথায়, এত স্বরের, এত গ্রামের, এত উঁচুনিচু কান্না? আর, যে সেই কান্নার এত মানে জেনে গেল, সে-ই-বা কোত্থেকে জানল, কান্নার এতই মানে আছে? এমন বোঝাবুঝিটা তৈরি হল কোথায়, কখন? কেমন করে? এটাও কি সেই ব্রতের অঙ্গ, এই কান্না? সেই জন্মের ব্রতের অংশ। যে এটাকে ব্রতের পূর্ণতায় গ্রহণ করতে পারবে না, সে ছিটকে যাবে। যাঁরা বহু সন্তানকে পিতা হওয়ার যোগ্যতা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরা বলেন, 'ছেলে ভালবাসা থেকেও হয়, অ-ভালবাসা থেকেও, ইচ্ছেতেও হয়,

অনিচ্ছেতেও হয়, হিশেব কষেও হয়, হঠাৎও হয়, কিন্তু এ-সব তো ছেলে হওয়ার আগের কথা, এই সব ভালবাসা বা অভালবাসা, এই সব ইচ্ছে-অনিচ্ছে, এই সব হিশেব-হঠাৎ। একবার মা-ছেলে দুইজন আলাদা হলে, একবার মায়ের মুখ ছেলে, আর ছেলের মুখ মা, দেখলে, তখন সবটাই ইচ্ছে গো ইচ্ছে, সবটাই শুধু ভালবাসা গো ভালবাসা। শত বিয়োনিরও শেষ সন্তান, প্রথম সন্তান।' পৃথিবীর সব শিশুই, পৃথিবীর প্রথম শিশু। পৃথিবীকে তার ভাষা শিখে নিতে হয়। আর, কান্না ছাড়া তার ভাষা নেই।

নয়

কান্নার কথা ফুরতে চায় না কেন? ও কত কান্না কেঁদেছে? সব বাচ্চা যেমন কাঁদে, তেমনি কেঁদেছে। তার বেশি তো আর কাঁদেনি। তাহলে ঘুরেফিরে সেই কান্নার কথা এত বিস্তারে উঠে আসছে কেন। ও তো হাসতও। তবে কান্নার যেমন সময়-অসময় ছিল না, হাসির বেলা তা নয়। তার সময় বাঁধা ছিল। বুকের দুধ খেত একেবারে হামলে, যেন ওকে না-খাইয়ে রাখা হয়েছে। এক স্তন যখন খেত, তখন আর-এক স্তনে হাত দিয়ে থাকত, যেন সেই স্তনে হাত রেখে স্তন্যপানের জোর পেত। মাথার ঘাম বোঝা যেত না, মাথা তো তেল জবজবে। কপাল বিন্দু-বিন্দু ঘামে ভরে উঠত, গলার ভাঁজগুলোতে জল জমত। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে হত। আর সেই স্পর্শে ওর মনে হত, কেউ ওকে বাধা দিচ্ছে। যেন মনে হয়, ঘাড়ের একটা ঝাপটে সেই আঁচল সরিয়ে দিত। ঝাপট দেবে কোথা থেকে? ওর ঘাড় কি তখন শক্ত হয়েছে? তবু যেন মনে হত, পাছে কেউ ওকে বুক থেকে সরিয়ে নেয়, ও যেন ঝাপটই দিল। যাঁরা অনেক সন্তানকে জন্ম দিয়ে, বড় করে, তখন দিদিমা-ঠাকুমা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত, তাঁরা মৃত্যুও দেখেছেন অনেক, সেই বহুপ্রসূতি ও বহুদর্শিনীরা বলেছিলেন, 'ঘাড় শক্ত হয় সবার শেষে আর ঘাড় নরম হয় সব শেষ হয়ে গেলে।' সারা শরীর ঘামিয়ে স্তন্যপানের পর, মুছিয়ে-শুকিয়ে ওকে যখন বিছানায় শুইয়ে দেয়া হত আর দুপাশে বালিশ ঠেলে দেয়া হত, তখন ও দুহাত দুপা আকাশে মুহুর্মুহু ছুঁড়তে থাকত, গলা দিয়ে নানা রকম আওয়াজ তুলত, একটু দুধ আর জল কোনো-কোনো সময় ঠোঁট বেয়ে নেমেও আসত আর ওর ঠোঁট যেমন ছড়িয়ে পড়ত, ওর চোখে আলো যেমন চিকচিক করে উঠত তাকে তো হাসিই বলে,-সারা শরীরের হাসি। ওর চোখের তখনো দৃষ্টি হয়নি, তখনো আলো চেনেনি, ঘাড়ও নাড়াতে পারে না, ওর কানের তখনো

শ্রবণ হয়নি, কোনো আওয়াজ শুনলে তাকায় না কিন্তু স্তন্যপানের পর এই কিছুক্ষণ ওর গলার শব্দ, মুখের উজ্জ্বলতা, চোখের দীপ্তি আর হাত-পায়ের চাঞ্চল্য দেখে, এই কথা ভাবতে মন চাইত,ও আলো দেখছে, রঙ দেখছে, ধ্বনি শুনছে, আর নেচে-নেচে উঠছে। চোখের ওপর করতল দিয়ে বাতাসের ঝাপট দিলে ও যদি নিমেষ ফেলত, সেটাকেই আমরা ভাবতাম, ওর দৃষ্টি হয়েছে। সে তো ও নিমেষ ফেলত হাওয়ার ঝাপটায়, আলোর প্রতিফলনে নয়।

দশ

পা-হাত ছুঁড়ত কেন এত বাতাসে? এক তখনই বাতাসে সিরসির করত শরীর? ওর তো আর কিছু নাড়াবার ছিল না, তাই হাত-পাই নাড়াত। তাও, ঐ পেট পুরে খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে কেন? পৃথিবীর সব বাচ্চারা চিরকালই ঐ বয়সে হাত আর পা বাতাসে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে খেলে থাকে। যাঁরা নিজেদের ও আরো অনেকের অনেক সন্তান মানুষ করেছেন তাঁরা বলেন, 'দুধটা সারা শরীরে ছড়িয়ে নিচ্ছে, হাতে নিচ্ছে, পায়ে নিচ্ছে, গায়ে নিচ্ছে, পিঠে নিচ্ছে। যেমন রোদ নেয়।' এ-সব জানা আছে। জানা আছে। তবু এই পৃথিবীতে ঐ ত ছিল সেই প্রথম শিশু, যার আগে কেউ আর-কোনোদিন স্তন্যপানের আগে জেগে ওঠেনি, জেগে উঠেই দুধ খায়নি আর দুধ খেয়েই এমন হাত-পা নাড়িয়ে যুদ্ধ করেনি। ওর হাঁটুর ওপর উরুতে একটা গভীর ভাঁজ ছিল, সে-ও তো সব বাচ্চারই থাকে। ও যখন পা ছুঁড়ত, তখন ভাঁজটা খুলে পা-দুটো যেন লম্বা হয়ে যেত। আবার, পা গুটনোর সময় পা-দুটো যেন আর-একটু গোল হয়ে ছোট হয়ে যেত। হাতেও ছিল এমনি একটা গোলাকার ভাঁজ—মাংসের ভিতর সেঁদিয়ে যাওয়া, মনে হত কেউ তামার বালা পরিয়ে দিয়েছে। যাঁরা বহু সন্তানের শরীরের বহু চিহ্ন তাদের জন্মের পর দেখেছেন, তারপর সারা জীবন সেই সব জন্মচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যেতেও দেখেছেন, তাঁরা খুঁজে-খুঁজে বের করতেন, এই দেখো, এ ছেলের কানের ভিতরে তিল, এর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাবে। সেটা ভাল কী খারাপ বোঝার জন্যে, ও যখন ঘুমিয়ে থাকত, তখন কান টেনে-টেনে দেখতাম আর দেখতে-দেখতে তিলটা আবার মিলিয়েও যেত। সে-কথা কাউকে বলাও যেত না, আর জানাও যেত না, তিল উঠে যাওয়ার পরও কি তিলের ফল ফলতেই থাকবে? তখন আবার তাঁদের কেউ কোনো একদিন ওর গলার অত ভাঁজ খুলে-খুলে কোথায়

কোন কোণে একটা তিল বের করতেন—ছেলের কাণ্ড দেখেছ? এ তো শ্বশুরের টাকায় রাজা হবে, হাতিঘোড়া পণ পাবে। সে-তিলটা সব সময় দেখা যেত না। দু আঙুলে গলার ভাঁজ খুলে-খুলে দেখতে হত। কোনো-কোনো তিল দেখে ওঁরা হেসে কুটিপাটি হতেন। তারপর ওকে ডেকে-ডেকে বলতেন, একে বলে মদনমোহন, জন্ম থেকেই বৌয়ের সুখের কথা ভেবে রেখেছে। অন্য বয়সিনীরা আবার হাসতে-হাসতেই জুড়ে দিতেন—যত কষ্ট, তত সুখ।

এগার

ঘরগুলি ছোট-ছোট ছিল, জানলাগুলিও ছোট-ছোট. কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি। খুব গরমের দেশে, বা মরুভূমিতে, যেমন এরকম বাড়ি হয় সব। ছোট-ছোট জানলা দিয়ে বাইরের তাপ, বালি এই সব ভিতরে ঢুকতে পারে না। কিন্তু এখানে তো ঘরের পাশেই একটা নারকেল গাছ। তার এক-একটা ডাল, এতই ঝুলে পড়ত যে এ ঘরের এই জানলাগুলো যদি আর-একটু বড় হত, তাহলে দুপুরের পর নারকেল গাছের ঝোলা পাতার ছায়া এ-ঘরের মেঝেতে দোল খেত। একদিন কেউ ওকে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল লম্বা বারান্দা দিয়ে, যার ডান হাতে রোদ ও আকাশ ভরা এক টুকরো শুকনো উঠোন পড়ে। যে নিয়ে যাচ্ছিল, সে তার ঘরে ঢুকে গেছে। সে-ঘরের জানলা-দেয়ালও এমন, যেন বাইরে মরুভূমি। সে ওকে কোলে নিয়ে বিছানায় বসে ছিল। তাই তো বসবে। ওকে নিয়ে তখনো খেলা যায় না—ঐ কোলে নিয়ে একটু বসা যায়, তারপর ওর শরীর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আপন মনে একটু-আধটু কথা বলা যায়। ও যদি তখন পুরো জেগে থাকে তাহলে এমন খেলার সময় ওর গলা দিয়ে একটু-আধটু আওয়াজ তুলত। একটা আওয়াজ আর-একটা আওয়াজের মতন নয়। যে কোলে শুইয়ে কথা বলত, সে সেই সব আওয়াজকে ভেবে নিত, কথার জবাব দেবার চেষ্টা করছে ও। সে পাড়া কাঁপিয়ে জানান দিত, 'ওমা দেখো, দেখো, কী হবে আমার, ছেলে এখনো পাশ ফিরতে পারে না, আর এদিকে গলায় বুলি ফুটছে। আবার বলছে, হ্যাঁ, না, তা তো বটেই।' তার এমন উদ্ভট খবরে অন্য সব ঘর থেকে, কখনো-কখনো পাশাপাশি বাড়ি থেকেও, যখন তারা ছুটে আসত, যারা, যে-ছেলে পাশ ফিরতে পারে না সে ছেলে কথা বলতে পারে এমন আশ্চর্য দেখতে ছুটে এসে ভিড় করত, তখন ও হয়তো গলা দিয়ে একটাও আওয়াজ বের

করত না, হাজার মিনতিতেও করত না, কারো মুখরক্ষার জন্যেও করত না। তখন ও হয়তো নিজের দু হাত নিয়ে খেলতে-খেলতে এক হাতের মুঠোয় আর-এক হাতের দুটো আঙুল ধরে ফেলে আর খুলতে পারছে না। বরং যতই খুলতে চেষ্টা করছে, ততই ডানহাতের আঙুল ধরা বাঁ হাতের মুঠো আরো শক্ত করে চেপে ধরছে, তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে নিজেরই ব্যর্থতায়। যতটা ওর পক্ষে কান্না সম্ভব, ততটা জোরেই কেঁদে উঠত। যারা ওর কথা বলার খবর শুনে দৌড়ে এসে ঘিরে ধরেছিল, তারা পরিবর্তে ওর কান্না শুনে কম উৎফুল্ল হয় না। ও কেন কাঁদছে, সেটা জানবার বা বোঝার কোনো উদ্বেগ কারো মধ্যেই ছিল না—বরং সবার মধ্যেই ছিল ওর কান্না থামানোর কেরামতি দেখানোর নানা কশরত। এই সময় কখনো-কখনো কোলবদলও ঘটে যেত। আর এত সব ঘটনায়, বা হয়তো নিজেরই কান্নার দমকে, ওর বাঁ হাতের মুঠো এমন আলগা হয়ে যেত যে ও দুই হাতই আবার আকাশে মেলে ধরতে পারত। ওর কান্না থেমে যাওয়া ও দুই হাত আকাশে নাচানোর মধ্যে কেউ-কেউ ওর পছন্দ-অপছন্দ, এমনকী পক্ষপাতিত্বও খুঁজে পেত ও সেই অধিকার প্রয়োগ করতেও চাইত।

বারো

একদিন কোনো এক উপলক্ষে, ঐ রকমই পাড়া জাগানো চিৎকার করে উঠল, 'দেখেছ, দেখেছ, ছেলে আলো চিনেছে, আলো চিনেছে।' এমন সব ঘোষণার মধ্যে একটা জয়ধ্বনি থাকে। জানাই তো ছিল, ও আলোও দেখবে, ধ্বনিও শুনবে। জানাই তো ছিল, ও ডাকলে সাড়াও দেবে, দু-একটা করে মুখও চিনবে। জানাই তো ছিল, ও আমাদের পক্ষে অনির্ণেয় কোনো কারণে কোনো ধ্বনির সঙ্গে কোনো মুখকে জড়িয়ে ফেলবে ও কোনো-কোনো মুখকেই ধ্বনি ভাববে বা ধ্বনিকেই মুখ ভাববে। এসবই জানা কথা, কিন্তু এসবই ওর বেলায় প্রথম ঘটবে। ও তো কাউকে দেখে বা কিছু জেনে ঐ সব আলোধ্বনি দেখাশোনা, মেলানো-মেশানো শুরু করছে না। সবটাই ওর মৌলিক, একক ও প্রথম আবিষ্কার। তাই প্রত্যেকটা ঘটনাই চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের মত পুনরাবৃত্তিহীন মৌলিক ঘটনা। ও আলো চিনেছে, এমন একটা ঘোষণার পর সবাই ঘিরে ধরলে বোঝা যায় না, ওর আলো চেনার নির্ভুল প্রমাণটা কোথায় পাওয়া গেল ? ওর চোখের দুটো মণি তেমনি সংযোগহীন যাতে বোঝা যায় না, ও কিছু দেখছে কীনা। সেই মণিদুটির সংযোগহীনতা এমনই চঞ্চল,

অস্থির ও তার চোখের মণিদুটি জলে ভাসা পদ্মপাতার ওপরে জলবিন্দুর মত এমন টলটলে যে, এটাও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না যে, ও সত্যি-সত্যি কিছু দেখছে না। কিন্তু যে-অমন পাড়া-জাগানো রব তুলেছিল, সে ততক্ষণে ঘন নিশ্বাস ফেলে তার কাহিনী বলতে শুরু করেছে, 'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, বিশ্বেস করো, আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি। আমি তো ওকে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে নিয়ে এসে বসেছি, বসতেই দেখি ঘাড় পেছনে হেলিয়ে চোখ উলটিয়ে দরজার দিকে তাকাতে চায়। আমি ওকে কোলে নিয়ে বসতেই দরজাটা ওর মাথার পেছনে পড়েছে। কী বোকা! ও ভেবেছে চোখটাকেই ও মাথা দিয়ে গড়িয়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে আলো দেখতে পারবে। আলো দেখতে হলে যে ঘাড় ঘোরাতে হয় সেটুকু বুদ্ধি নেই। তবে, আলো না দেখতে চাইলে ও উঠোনের দরজার দিকে অমন করে চোখ ঘোরাতে চাইবে কেন, বলো?' যে-নিজের চোখে এমনই অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখেছে, তার প্রত্যক্ষদর্শনের সাক্ষ্যের পর ও বিশেষ করে সেই ঘটনা ওর স্বাভাবিক বোকামির সঙ্গে এমন মিলে যাওয়ার পর, এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণই কি থাকতে পারে, যে, ও সেদিন সেই ক্ষণে, আলো দেখেছিল, বা আলোকে আলো বলে চিনে নিতে পেরেছিল? তারপরে ভুলে গেছে কী না, তা কে জানে। কেউ তো আর জানে না, এমন এক-একবার চিনে ও বহু-বহুবার ভুলে-ভুলেই মানবশিশুকে আলো ও অন্ধকার চিনে নিতে হয় কী না। তখন থেকেই তো আন্দাজ শুরু হল, সে কতটা আলো চিনেছে। তাই তার মাথার দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সরে তার পায়ের দিকে চলে গেল। এ ওর কাঁধের ফাঁক দিয়ে ওর মুখ-চোখ দেখতে লাগল। আর এতগুলো মাথা ও শরীরে ছোট-ছোট জানলা দিয়ে আসা আলো সত্যি আটকে গেল। যে-একটামাত্র জানলা দিয়ে আলো আসছিল, সেটাও, যে কোলে নিয়ে বসেছিল, তার বসা দিয়ে আটকানো। খোলা ছিল এক দরজাই, যেখান দিয়ে বাইরের দুপুরের আলো, রোদ নয়, আলো, নানা ছায়াপাত করে ঘরে ঢুকেছিল। তাহলে, ওকে যদি আলো দেখতেই হয়, ও দরজার দিকে চোখ ঘোরাতে চাইবেই। এ-কথা সত্যি যে কপালে এমন ভাঁজ ফেলেছিল ও চোখের মণিদুটোকে অসংযুত ভঙ্গিতে এমন ওপরের পল্লবের দিকে ঠেলছিল, অন্তত দু-একবার, যে, কারো-কারো মনে হতেও পারে, ও ওদিকে আলোই খুঁজছে। 'আলো মানে তো রঙ, তাহলে ও রঙ চিনবে। লালফুল কী আছে, নিয়ে এসো, লা-ল-ফু-ল।' ওরা অসময়ে রক্তবর্ণ ফুলচয়নে বেরিয়ে যায়।

তের

কখন যে কী ঘটে যেত, সেটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের। যেমন করে, মানুষের শিশু জন্মায়, তেমনি করেই ও জন্মেছে। যেমন করে, মানুষের শিশু বড় হয় তেমনি করেই ও বড় হচ্ছিল। বড় হচ্ছিল, মানে, পুরো একটা মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, রঙ চিনবার ক্ষমতা, ধ্বনি চিনবার ক্ষমতা, হাঁটাচলা, কথাবলা ও আয়ত্ত করছিল। আয়ত্ত করাটাই তো স্বাভাবিক। এর কোনো একটা আয়ত্ত করতে যদি কিছু কমতি হত, তাহলে তো ডাক্তার-বদ্যিতে ছয়লাপ হয়ে যেত। যা ও একবার আয়ত্ত করছিল, তা তো আর ও ভুলছিল না। বরং সেটাকে ক্রমেই জটিল করে তুলছিল। এর সবটাই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিকের চাইতেও স্বাভাবিক। সহজের চাইতেও সহজ। একটি মানুষের শিশু মানুষেরই সব ব্যবহার ধীরে-ধীরে আয়ত্ত করে নিচ্ছে —তার ভিতর তো অস্বাভাবিক কিছু নেই। তাহলে এত বিস্ময় এসে জমা হয় কেন? কোথা থেকে? আর ওরও স্বভাব কেমন অদ্ভুত! একটু আঁচ দিয়ে সবাইকে নাচিয়ে তুলে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ওর এই টানেই ও সবাইকে টানে। যখন যাবার ইচ্ছে থাকে, তখন যে কোলে নেয় তার কোলেই যায়। আর যখন তার কোলে থাকার ইচ্ছে ফুরিয়ে যায়, তখন তারস্বরে নিজের অনিচ্ছে জানিয়ে দেয়। হাজার মাথা খুঁড়লেও আর ওর মন ফেরানো যায় না। যাকে ও প্রত্যাখ্যান করল, তার তখন কী অবস্থা। আজকাল নাকী সবই বইয়ে লেখা থাকে। শাহেবরা হিশেব কষে বের করে দিয়েছেন, পেটের ভিতর বাচ্চা কী ভাবে বাড়ে। শাহেবরা ছবি এঁকে-এঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, জন্মের সময় যা ওজন থাকে, জন্মের পর তা কী নিয়মে বদলায়। শাহেবরা ক্যালেণ্ডার মিলিয়ে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছেন, কোন মাসে বাচ্চা আলো-অন্ধকার চিনতে শেখে, শব্দ-নৈঃশব্দ্য বুঝতে শেখে, সজনতা-নির্জনতার আন্দাজ পেতে শেখে, মুখ চেনে, কোল বাছাই করে, কারো-কারো কোলে যায় ও কারো-কারো কোলে যায় না, নিজের সুবিধে-অসুবিধে, সম্মতি-আপত্তি বেশ স্পষ্ট জানিয়ে দিতে পারে, একটু গড়াতে পারে, চিত থেকে কাত হতে পারে, কাত থেকে উপুড় হয়ে যেতে পারে। স-ব শাহেবরা জানে ও আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। তবু ও ওর প্রতিটি কাজে এতই নতুনত্ব আর এতই চমক তৈরি করে কোথা থেকে? প্রতিদিন?

চোদ্দ

আর কখন যে সে-চমক লাগবে কেউ কী তা বলতে পারে? আমি এখন

তোকে দেখে-দেখে চমকে-চমকে উঠতে চাই। নতুন মেঘে আকাশের দিকগুলো যেমন চমকে ওঠে অথচ সেই বিদ্যুচ্চমকের ধ্বনি শোনা যায় না, আমি সমাজ-সংসারের সব কাজ সেরে এসেছি, তোকে দেখে-দেখে চমকে-চমকে উঠব বলে। আর, সেই সারাদিনের প্রস্তুতি আর প্রত্যাশাকে ও যে কী তুচ্ছই করল! কোলে তুলতে গেলে কেঁদে ওঠে। ওর বিছানায় শুইয়ে দিলেও হাত-পা নাড়ায় না। একেবারে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। অনেকক্ষণ ওর খোলা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায়, বহু সময়ের ব্যবধানে পলক পড়ছে বটে, চোখের মণিদুটো দুই চোখেই বাঁ কোণে সরে এসে স্থির হয়ে আছে। একেবারে যে স্থির হয়েই আছে তা নয়, চলকে সরে আসতে চাইছে, তবু যেন এক জায়গাতেই আছে মোটামুটি। যেন ওর একটা দৃষ্টিপথ আছে, সে-দৃষ্টিপথ অনুসরণও করা যায়। তাহলে ও কি নিজেরই দৃষ্টিপথে নিজে হারিয়ে যাচ্ছে? একবার আন্দাজ করতে ইচ্ছে হয়, কিছু দেখছে নাকী, কী দেখছে। কোথাও আটকে গেছে নাকী দৃষ্টি? কোথায়? ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কিছু খুঁজে না পেয়ে আবার ওর চোখেই ফিরে আসি। ও তেমনই নিঃসাড়ে চোখ মেলে পড়ে থাকে, দুটো চোখের মণি ঐ একই দিকে কোনাচে রেখে। ওকে নাড়িয়ে দেয়া যায়। আমি নাড়িয়ে দিতে পারি না। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে এক সময় বুঝে ফেলি ও দেখতে শিখেছে, দেখতে চাইছে, দেখার জন্যে মানুষকে দুটো চোখের মণিকে একই জিনিশের ওপর ফেলতে হয়, সেখান থেকে আলোর প্রতিফলন একই বিন্দুতে এসে চোখে মেলে। তাকেই বুঝি দৃষ্টি বলে। ওর মাথা যেটুকু এদিক-ওদিক করে তার সীমানার মধ্যে কোথাও কোনো আলোর প্রতিফলনে ওর দুচোখের মণি আটকে গেছে। ও আটকে রাখতে পারবে না, যে-কোনো মুহূর্তে ছিটকে যাবে, ও আবার আলোহীন হয়ে যাবে। এই ভাবে ও ধীরে-ধীরে আলো গ্রহণ করা শিখছে। আজই এমন হল প্রথম? নাকী, আগেও কখনো-সখনো হয়েছে? এখন এমন প্রায়ই হবে। আমি বুঝতে পারব, যদি নজরে-নজরে রাখি? বুঝতে পারব, যেদিন প্রথম আমাকে দেখতে পাবে? সে কী ভাবে দেখতে পাওয়া হবে? ও দেখতে পাবে, যেন আমার মুখের ওপর থেকে গভীর জলস্তর ধীরে-ধীরে ধীরে-ধীরে প্রতিদিনই একটু-একটু করে সরে-সরে যাচ্ছে আর জলস্তরের ভিতর থেকে আমার মুখটা ওর কাছে স্পষ্ট হচ্ছে? নাকী, আমার মুখটাই জলস্তর ভেদ করে ভেসে উঠবে? সে আমি কী করে আন্দাজ করব? আমার দৃষ্টি তো কোনো জলস্তর ভেদ করে ওকে দেখছে না! আমি তো দু চোখ

ভরে দেখি ওকে, দু চোখে যতটা দৃষ্টি আছে আমার, তার চাইতেও কিছু বেশি দৃষ্টি দিয়ে।

পনের

একদিন ঘরে অন্য একটা কাজে ঢুকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে গলা তুলে কার ডাকে যেন সাড়া দিয়েছি, আর হঠাৎ দেখি ও যেন চমকে ঘাড়টা একটু হেলাতে চায়। ও কি শুনতে পেল ? আমার গলা ?. আওয়াজ শুনল ? নাকি আমার গলা বলে চিনে ফেলেছিল ? আমি অকারণে আবার গলা তুলে মিছিমিছি সাড়া দিই। এবারও মনে হল, যেন ঘাড়টা একটু হেলাল। ঘাড় হেলাবে কী করে ? ঘাড় তো শক্তই হয়নি। তবু ঐ শুনতে পেলে যেমন ঘাড়ে সাড়া জাগে তেমনি আর কী। আমি তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে ওকে ডাকি, 'সোনা', 'সোনা'। জোরে-জোরে গলা তুলে ডাকি। ও দু হাত দু পা তুলে বাতাসে ছুঁড়তে থাকে, ছুঁড়তে থাকে, আর গলায় কী সব আওয়াজ তোলে। কী করে বুঝি, আমার গলার আওয়াজেই এমন করছে, নাকী এমন করছে বলেই মনে হচ্ছে বুঝি আমার গলা শুনতে পাচ্ছে। ও তাকাল কী না বুঝি না, ও শুনল কী না বুঝি না, ও সাড়া দিচ্ছে কী না বুঝি না, ও আমার সঙ্গ নিচ্ছে কী না বুঝি না, আমি থাকা সত্ত্বেও ও একা হয়ে আছে কী না বুঝি না—অথচ ও সব দিনরাত ভরে আছে আর প্রতিটি ক্ষণে কিছু একটা বিস্ময়কর ঘটিয়ে চলেছে। এ যে কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এক জীবনযাপন ছিল—পরে ভাবলে মনে হয় এত রহস্য তখন জম্মাত কী করে, ক্ষণে-ক্ষণে, আর অত অনিশ্চয়তা নিয়ে কী করে ওকে বুকে তুলে নিতাম, পাশে নিয়ে শুতাম, কী অবলীলায় ওর হাত-পা ধরে নাড়াতাম। অত রহস্য আর অনিশ্চয়ে তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার কথা। অথচ আমারও সারা শরীর অমন নবীনতায় উপছে উঠত কেন, যেন, জীবনের সবচেয়ে নিশ্চয়তা আর স্পষ্টতার ভিতর দিয়ে দিনগুলো শুরু হয়ে শেষ হয়ে যেত। দিনের পর আর-একটা দিন ওকে ভর দিয়েই যেন ফুটে উঠত।

ষোল

একদিন ওকে খাওয়াবার জন্যে তৈরি হয়ে, নিজের শরীর আলগা করে, যে-জানলা দিয়ে কোনাকুনি বাতাস ঢুকে আর-এক জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায় তার দিকে মুখ করে, স্বস্তিতে একটু শ্বাস ফেলেছি এই ভেবে যে ও জেগে

উঠবার আগেই আমি তৈরি হয়ে নিতে পেরেছি, এখন ওকে দুহাতে তুলে কোলে ফেলব আর ঘুমন্ত ঠোঁটেই বুক গুঁজে দেব, তাকিয়ে দেখি, ও পাশ ফিরে, সত্যি পাশ ফিরে, চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। তাকিয়েই আছে। আর আমি ছাড়া আর তো কেউ ওর দৃষ্টিপথে নেই, তাহলে, আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমার দিকে সোজাসুজি তাকাতে হলে তো ওর ঘাড়টা একটু সোজা রাখতে হত। সেটা পারেনি। তাহলে কি আমাকে, আমাকে চোখে নিয়েই ওর নরম ঘাড়টা বালিশের দিকে হেলে গেছে। ওকে তুলবার জন্যে আমি যে-হাত বাড়িয়েছিলাম, তা গুটিয়ে নিয়ে আমি সেই খোলা জানলার দিকে তাকিয়েই বলি, 'কাণ্ড দেখেছ, কখন পাশ ফিরে চুপটি করে শুয়ে আছে! তুই আবার পাশ ফিরতে শিখলি কবে?' নাকী, টের পেয়েছে, এখন আমি ওকে খাওয়াব, তাই পাশ ফিরে তাকিয়ে আছে? আমি অনেকগুলো জিনিশ গুলিয়ে ফেলেছিলাম। বা, এখন বলা যায়, আমি অনেকগুলো ঘটনাকে এক করে দিয়েছিলাম। তখন এটুকুই হয়তো সত্যি ছিল যে ওর খাবার সময় হয়েছে, ও জেগে উঠেছে, তখনো কেঁদে ওঠেনি, আর সেদিনই প্রথম একা-একা পাশ ফিরেছে। হয়তো শরীরে ঐ পাশ ফেরার একটা কায়দা রপ্ত করছিল বলেই খাওয়ার জন্যে কেঁদে উঠতে ভুলে গিয়েছিল। বা, এমন কি একেবারেই হতে পারে না যে গন্ধে হোক, যে-বাতাস ঘরের ভিতরে আলোড়িত হয়, সেই বাতাসের আলোড়নের হেরফেরে হোক, কোনো একভাবে ও টের পায় যে আমি কাছাকাছি কোথাও আছি। তাই কাঁদে না। আমাকে টের পায় কী না, তা নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা ছিল কেন? যেন, এখনো আছে? যখন ও সেই অসূর্যপ্রদেশে অন্ধকারে দৃষ্টিহীন পা ফেলছিল কতদিন ওর লাগবে আত্মহনন পর্যন্ত পৌঁছুতে, তখন, তখনো, তো এই আকাশ-বাতাস, গোলার্ধভরা বাতাসেই ও নিশ্বাস নিত। তখন, তখনো কি বাতাসের স্পর্শে কী গন্ধে ও টের পেত না, আমি আছি, কাছাকাছি? নাকী তখন আর ওর কাছাকাছি বলে কিছু ছিলই না।

সতের

আমি ওকে কোলে তুলছিলাম না, পাশ ফিরে কী করে ও, তাই দেখতে চাইছিলাম। ঘাড়টা হেলে এতটাই বালিশের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল যে ওর বুঝি শ্বাস টানতে অসুবিধে হয় আর ও ভ্যাঁ করে কেঁদে দেয়। ওকে দুই হাতে কোলে ফেলতে-ফেলতে বলি, 'আরে বোকা, নিজেই বুঝিসনি, পাশ ফিরে

গেছিস, তারপর আর সোজা হতে পারছিস না? তুমি শুধু কাঁদতে পারো, ভূত কোথাকার,' এরপর ওর মুখে বোঁটা গুঁজে খুব নিচু স্বরে ওর সঙ্গে আমার আলাপ চলতে থাকে। সেই আলাপের ফাঁকে-ফাঁকে ঘর ভরে ওর শোষণের শব্দ আর তরল গেলার আওয়াজ ছড়াতে থাকে। এত এত বছরের ব্যবধান থেকে তো, আর, আরো এমন ব্যবধান থেকে, যার তরণ কোনো কালে কখনো সম্ভব নয়—আর, এমনই ব্যবধান এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে গিয়ে আবার যদি এ-জন্মের স্মৃতি নিয়ে আমার পুনর্জন্ম হয়, তাহলেই এক তা ঘোচানোর অভিযান শুরু হতে পারে, নইলে মানুষের বেঁচে থাকা মানে তো, ঐ ব্যবধানটি, ঐ তরণহীন ব্যবধানটি, কত রকম ভাবে সে তার জীবনযাপনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে তারই নতুন-নতুন কৌশল আয়ত্তের চেষ্টা ও ব্যর্থতা ও পুনর্চেষ্টা —এমন ব্যবধান থেকে তো এখন কেমন অনায়াসে বুঝতে পারি ঘাড় সোজা হওয়া, পাশ ফেরা, কোমরের পেশি কর্মক্ষম হয়ে ওঠা, আলো চেনা, রঙ চেনা, শব্দ চেনা মানবশিশুর, সব মানবশিশুরই এই দেহজাগরণ একসঙ্গে ঘটে উঠতে থাকে, কারো এটা একটু আগে, কারো এটা সামান্য পরে, কিন্তু কখনোই শিশুর শরীর-জাগরণের সমূহ সঙ্গতির সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটে না, ঘটতে পারে না, এ এক অলঙ্ঘনীয় স্থিরীকৃত কর্মসূচি, কিন্তু, তখন, সেই কত আগে, সেই ওর জন্মের পরের দিনগুলোতে, মাসগুলোতে, আমার একবারের জন্যেও এই সঙ্গতির কথাটা মনে আসত না কেন, বরং মন ভরে থাকত কেন, চোখ এই প্রত্যাশায় ভরে থাকত কেন, যে, এর প্রত্যেকটাই আলাদা-আলাদা করে ওর এক-একটা জয়, এক-একটা অভিযানের শেষে পতাকা প্রোথিত করে নিজের সীমানা বাড়িয়ে নেয়া। তখন এই সব মিলে অবিরত যেন এক-একটা কাণ্ড ঘটে যেত, কী যে সব কাণ্ড!

আঠার

সত্যি যদি হিশেব কষতে বসা যায়, তাহলে আর-কদিনের ব্যাপার? মানুষের সারা জীবনের তুলনায় কটা দিন, বা, বড় জোর কটা মাস আর লাগে ঘাড় শক্ত হতে, কোমর শক্ত হতে, নিজে-নিজে উল্টে যেতে আর তারপর নিজের দুহাত আর দুহাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় হেলিয়ে একবার জগতটাকে মাপতে, বিজিত হওয়ার জন্যে যে-জগৎ তার সম্মুখে নিজেকে খুলে দিয়েছে আলোতে-অন্ধকারে, সেই জগতটাকে মাপতে? কিন্তু তখন তো মনে হত দিনের পর দিন কেটে যায়, ওর যেন কিছুই বাড়ে না। কোনো বেশ

টলটলে বাচ্চা দেখে এলে কোনোদিন, সব সময় ওর সঙ্গে তুলনা করতাম। ও যেন আর-সবার মত বাড়ছে না। ওর হাতগুলো যেন সরু-সরু। সেই অন্য বাচ্চাটির উরু কী মোটা দেখাত। পেছনটা যেন উপচে ছড়িয়ে পড়ত। আর, এ-সব কথা একবাব মাথায় ঢুকলে আর বেরতে চায় না। কাউকে বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। কোনো ডাক্তার দেখাতে ইচ্ছে করত তখনি। কিন্তু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ারও তো কিছু একটা ছুতো দরকার। বাড়িতেই-বা বলব কী? আর ডাক্তারকেই-বা বলব কী? বলার তো আছে আমার একটা কথাই—ডাক্তারবাবু ও আর-সব বাচ্চার মতই বড় হচ্ছে তো? আমার মনে হয়, হচ্ছে না। এমন ভাষায় কথা বলা যায়, এমন ডাক্তাবের সংখ্যা কত কমে গেছে, আছে কীনা জানা নেই। তাও যে ডাক্তারের কাছে যাইনি, অকারণে, তা নয়। আমাদের ডাক্তারবাবুর আবার বাচ্চা দেখার ধরণ ছিল অদ্ভুত। বাচ্চার দুই পা ধরে উঁচুতে তুলে মাথাটা নীচে ঝুলিয়ে দিতেন আর বাচ্চা তারস্বরে কেঁদে উঠত, আর ডাক্তাববাবু তখন ওর মুখের ভিতরটা, নাকী গলার ভিতরটা, নাকী নাকের ভিতরটা দেখে নিতেন। অন্য মায়েরা তো হাঁ হা করে ডাক্তারবাবুর হাত থেকে ছেলে কেড়ে নিতে যেত আর ডাক্তারবাবু তাদের বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেন। আমি ঠিক কেড়ে নেয়ার মত কিছু করতে পারতাম না কিন্তু মুখে আঁচলচাপা দিয়ে ভাবতাম—কী দরকার ছিল আমার? ছেলেকে সোজা করে ডাক্তারবাবু ফেরৎ দিলে তাকে বুকে চেপে ধরতাম, টকটকে মুখ মুছিয়ে দিতাম, মাথার মাঝখানে ফুঁ দিতাম। আর ডাক্তারবাবু মিটমিট করে হাসতেন। ছেলের কান্না সহজে থামত না। কোলে নিয়ে বুকে চেপে একটু পায়চারি করতাম। এত বাগ হত নিজের ওপর। ডাক্তারবাবুর ওপরও।

উনিশ

এক শেষ সকালে দেখি, ঐ ছোট-ছোট জানলার কোনো একটি দিয়ে ঘরের ভিতর রোদের যে-ফালি ঢুকত, সেই সময়টিতে, সেটা ওর শুয়ে থাকার জায়গাটার ওপর দিয়ে যেত, যেন ও হাত বাড়ালে ধরতে পারে, কে বা কারা কখন এক সুতো দিয়ে বেশ বড় একটা লাল ফুল, কাগজের, ওর পেটের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। রোদের ফালিটা ঐ লাল ফুলটাকে আরো লাল করে রেখেছে। ফুলটা যখন দুলছে না, তখন ও ঐ আলো আর রঙে মাখামাখি ফুলটাকে দেখছে আর দুহাত দুপা আকাশে ছুঁড়ছে আর চোখ দুটোর মণি স্থির হয়ে আছে। বাতাসে ফুলটা একটু দুলে গেলে ওর চোখদুটো অত

তাড়াতাড়ি সরছে না, একদিকে সরতে-সরতেই ফুলটা আবার উল্টোদিকে চলে আসছে। কিন্তু ফুলের এই দোলনে লহমার জন্যে ওর দৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঐ রোদে লাল লালফুল ওর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। এই একটা রঙ ওর ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে বুঝতে পেরে, ও আনন্দে হেসে উঠছে, ওর গলা দিয়ে হাসির সেই তরল রব উদগত হচ্ছে আর ওর হাত-পা তত বেশি করে ছুঁড়ছে, যেন ঐ প্রতিফলনটা ওব আয়ত্তে এসে যেতে পারে। আমি ফুলটার দড়ি ধরে ফুলটাকে স্থির করে রাখি। আমার শরীরে রোদটা আড়াল হয়েছিল, একটু সরে রোদটাকে ফুলে লাগতে দিই। ওর হাত-পায়ের ছোঁড়াছুঁড়ি হঠাৎ থেমে যায়। সে-থামার ভঙ্গিও উদ্ভট। বাঁ হাতটা ছুঁড়েছিল—সেটা বাতাসেই থাকল। ডান হাতটা নামিয়ে নিয়েছিল, সেটা নামানোই থাকল। আর পা দুটো থাকল বাতাসে, একটু উঁচু-নিচুতে, দু পায়ের মাঝখানে সেই শূন্যতা যা ওর পায়ের চলনে পূর্ণ ছিল। চোখদুটো ঐ রোদে-লালে নির্নিমেষ। লাল রঙটা বোধহয় ওর দৃষ্টি ভরে দিচ্ছিল আর ও হাত-পা সব স্থির করে ফেলে সেই লালের আস্বাদ নিচ্ছিল দু চোখ ভরে। ও নিজের হাত-পা নাড়াচ্ছিল না, মুখটা হা করে ছিল, চোখদুটো গোল হয়ে ছিল। ওর শরীরের ভিতরে কোথাও ঐ রক্তিম রোদ, ঐ রৌদ্রাক্ত লাল, নিঃসীমে চলে যাচ্ছিল। একেই দৃষ্টি বলে ? একেই দৃষ্টি বলে ! হাওয়াতেই হোক, আমার বা ওর শ্বাসপতনেই হোক, ফুলটা ও রোদটা দুলে গেল। ও আবার আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে সেই লুপ্ত দৃশ্যের পুনরুদ্ধার ঘটাতে লাগল।

কুড়ি

কখন ও প্রথম দেখতে পেয়েছিল ? ঘাড় যখন ঘোরাতে পেরেছিল ? আমরা তো ঘাড় না ঘুরিয়েও দেখি। ও-ও তাহলে নিশ্চয়ই কখনো দেখতে শুরু করেছিল ? নাকী, ওদের কোনো শুরু হয় না। কোথাও কোনো একটা কিছু আমাদের অগোচরে ঘটে যেতে থাকে, একদিন, কোনো একদিন আমরা টের পাই। তাও আমরা সবাই যে এক দিনে একই রকম টের পাই তা নয়। আমরাও একটু-একটু করে টের পেতে-পেতে কোনো এক সময় জুড়ে সবটুকু টের পাই। আর কী অদ্ভুত ! ওর ডান কানের দিকে হাততালি দিই, ওর চোখের মণিদুটো ডান দিকে ঘোরে, প্রায় শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই। ওর বাঁ কানের দিকে হাততালি দিই, ওর চোখের মণিদুটো বাঁ দিকে ঘোরে। সঙ্গে ঘাড়ও একটু ঘোরে। কী অগাধ লাবণ্য এই ভঙ্গির ? এই চোখ দিয়ে শোনার ? তোর চোখ

দিয়ে শোনা নিয়ে তোর সঙ্গে কত খেলাই খেলতাম। তোর কানে যাতে সবচেয়ে সুন্দর আওয়াজগুলি পৌঁছয় সেজন্যে আমি না-হয় জিভ আর টাকরা আর মাড়ি আর ঠোঁট আর গলা দিয়ে কত আওয়াজ তৈরি করতাম, কত তরল সব আওয়াজ, কত নরম সব আওয়াজ, কত আনুনাসিক সব আওয়াজ। কিন্তু আমি তো তোকে শোনাতে চাইতাম, আমার কল্পনার সবচেয়ে মধুর ধ্বনি —অনেক রাতে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদীর স্রোতে নুড়িতে নুড়িতে যে-ধ্বনি জাগে, বাঁশবনের পাতায়-পাতায় যে-ধ্বনি জাগে, প্রান্তরের বটগাছের পাতার ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে যে-ধ্বনি বয়ে যায়, গঙ্গাজলের পাইপে জল উছলে উঠলে হাইড্রাণ্টের মুখে যে-ধ্বনি জাগে, কোনো এক কালে ঘটে যাওয়া ডাকাতির গল্পের ভিতর থেকে ঠোঁটে হাত চাপা দেয়া যে চাপা বম বম ধ্বনি এসে পৌঁছয়, আর দেখতে না-পাওয়া সব পাখিদের কত রকমের ডাক, শিসের কত ভাঙাগড়া। আমি পারব কোথা থেকে এত ধ্বনি তৈরি করতে, তোকে শোনানো যায় এমন সব রমণীয় ধ্বনি তৈরি করতে? কেউই তা পারে না, আমি তো পারিই না, কোনো হরবোলাও পারবে না। পারতেও নেই বোধহয়। ভুল ছিল কি তোর শ্রুতির সেই প্রতিরক্ষানির্মাণের মূলে কোথাও? আর, সেই ভুলের ফাঁক দিয়েই কি সব ভুল ধ্বনির কাছে তুই চলে গেলি? তখন তো আর কোনো প্রতিরক্ষা ছিল না।

একুশ

দু-চারবারেই বোঝা গিয়েছিল, ঘুম থেকে জেগে উঠলে ও বাঁদিকে কাত হতে পারে, আওয়াজ শুনলে চমকেও ওঠে কিন্তু একবার কাত হয়ে গেলে আর চিত হতে পারে না। আর যদি-বা শরীরটাকে চিত করতে পারে, মাথাটা ঐ বাঁদিকেই হেলে থাকে। ততদিনে ওর শোয়াটাও একটু বদলানো হয়েছে। একদিকে কাত করে পাশ বালিশের ওপর একটা পা চড়িয়ে দিয়ে ও একটা হাতও পাশবালিশের ওপর রেখে, ওর ওপরে একটা বালিশ চাপা দেয়া হত। ওর ঘুমভাঙাটাও যেন বদলে গেল। আগে ঘুম ভেঙে যেত বলে ও জেগে উঠত। এখন জেগে ওঠে বলে ওর ঘুম ভাঙে। একেবারে চমকে ঘুম ভাঙে। আর ঘুম ভেঙেই চিত হয়ে যায়, তাতে ওর ওপরের বালিশটা কখনো সরে যায়, কখনো-বা ওর বুকের ওপর, প্রায় মুখের ওপর উঠে আসে। ও তখন দুহাত দুপা বাতাসে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে নিজের শরীরের ঢেউয়ে বালিশটা সরিয়ে দিত। কখনো-কখনো বালিশটা তার এক হাতের ওপর গিয়ে পড়ত। তখন সে-হাতটা

নাড়াতে না পেরে কেঁদে উঠত, আর যদি বালিশটাকে শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে পারত, তাহলে, ভারমুক্ত শরীরটাকে নিয়ে নানারকম কায়দা-কানুন করত। বিছানার ওপর গোড়ালির ধাক্কা দিয়ে পেছিয়ে যেত, ফলে বালিশ চলে আসত কাঁধের নীচে আর ওর মাথাটা ঝুলতে থাকত। কখনো আবার ঐ বাঁ কাতে ঘুরে যেত, তারপর সেই অবস্থাতেই নিজের শরীরটাকে মোচড়াত। মাথাটা কিছুতেই সোজা করতে না পেরে, শরীরটাকেই আবার বাঁ কাতে ফেলে, শরীরটাকে আরো ঘোরাতে চাইত। আর দু-একবার শরীরটাকে উপুড় করে ফেলত। মাথাটা লেগে থাকত বিছানার সঙ্গেই। ঘাড়টাকে সোজা করার জন্যে নাকমুখ ঘষতে থাকত কিন্তু ঘাড়ও সোজা হত না, মাথাটাও তুলতে পারত না। তখন চিত করে শুইয়ে দিলে আবার শূন্যে হাত-পা ছোঁড়া শুরু হয়ে যেত, যেন, এতক্ষণ কী একটা ভুল করেছিল। এই সব নানারকম এলোমেলো ভঙ্গির ভিতর দিয়েই কি ওর শরীরটা তৈরি হয়ে উঠছিল —এই পায়ে চাড় দিয়ে মাথা পেছনে ঠেলা, এই কাত হওয়া, এই উপুড় হয়ে মাথাটা তুলতে না-পারা এগুলো এতই এলোমেলো হয়ে করত যে মনে হত যেন নিজের শরীরটাকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারছে না। আবার, সব মিলিয়ে রোজই যেন কিছু না কিছু বদলে যেত।

বাইশ

মেয়েরা ওকে কোলে তোলার জন্যে খেপে উঠত। সে বোধহয় বিশেষ করে ঐ কোঁকড়ানো এক রাশ চুলের জন্যে। চৈত্রে জন্ম ওর। পুরো গরমের সময়টা ঐ চুলে, ঘাড়ে ঘামাচি হয়ে গিয়েছিল, কপাল কেটে যেত। মাথার পেছন থেকে, পাশ থেকে আঁচড়ে চুল মাথার ওপরে চুড়ো করে দিতাম। কখনো-কখনো নিজেই সেটা খুলে ফেলত। কখনো-বা খুলে যেত। আর মেয়েগুলো ওর খোলা চুলটা বোধহয় ভালবাসত—একেবারে মুখমাথা ছাপিয়ে একরাশ চুল। মেয়েরা যেমন চাইত, ও তো আর তেমন করে ঘাড় ঘোরাতে পারত না। কাঁখে নিলে তো ওর হাত-পা নাড়ানোর উপায় থাকত না। কাঁধে ফেললে মাথাটা কাঁধেই হেলে থাকত। চুল যে কেটে ছোট করে দেব, তার কোনো উপায় ছিল না। যাঁরা এককালে বহুবার মা হয়েছেন ও দুই সন্তানের বয়সের পার্থক্য যাঁদের কখনো এমনকী মাত্র আঠার মাসও মাত্র, তাঁরা চুল কাটতে নিষেধ করতেন। গর্ভের চুল প্রথম কাটার নাকী অনেক নিয়ম। তাহলে, একমাত্র কোল পেতে ওকে শুইয়ে রাখা যেত আর ও হাত-পা আকাশে ছুঁড়ে

গলা দিয়ে নানা আওয়াজ তুলে ওদের সঙ্গে খেলত। ঐটুকু মেয়েদের সে আর কতক্ষণ ভাল লাগে? ওদের বরং বেশ লাগত ওকে রাগিয়ে দিলে ও যে গড়িয়ে পড়ত—সেই খেলা। বা, এমন কী ওকে উপুড় করে দিলে ও যে ঘাড়টা সোজা করে তুলতে চাইত, সেই খেলা—পেটের ওপর ভর দিয়ে বুক পর্যন্ত তুলতে চাইত। আবার মাথার ভারে শুয়ে পড়ত। এই সব খেলতে-খেলতেই কোনোদিন হয়তো উপুড় থেকে ও গড়িয়ে যেতে চেষ্টা করত। উপুড় হয়ে শরীরটা ডাইনে-বাঁয়ে দোলাত, দোলাত, দোলাতেই থাকত আর মেয়েগুলো ওর শোয়া শরীরের সেই দোলনকেই হাতে তালি বাজিয়ে-বাজিয়ে একটা তালে নিয়ে আসত, যেন ও হাতের তালি বাজিয়ে শরীর দোলাচ্ছে। এমন দোলন তো ওর শরীরে লাগে, যখন ও বসতে পারে, টলে পড়ে যায় না, ঘষে-ঘষে এগতে পারে না, অথচ নিজের সেই বসাটাকে উপভোগ করতে চায়। 'দোলে, দোলে, গোপাল দোলে, গোপাল দোলে, দোল দোল দোল দুলুনি, রাঙা মাথায় চিরুনি', হাততালির এই সব ছড়ার সঙ্গে সে তার কী মাতাল দুলুনি। আর নিজের শরীরের দোলনে সে তার কী ফুর্তি। নিজের ফুর্তিতে সে তার কী হাসি। হাসতে-হাসতে, দুলতে-দুলতে, সে হয় পেছনে, নয় পাশে টলে পড়ে যেত।

তেইশ

সেই সময় ওর কোমর জুড়ে রুপোর নিমফল বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। কে যে বানিয়ে দিয়েছিল, মনে নেই। আমি নই অন্তত। ওর সেজে ওঠার যত ছবি মনে আছে, সবই যেন প্রকৃতির থেকে আসা। রুপোর গয়না তো আর প্রকৃতি থেকে আসে না। কেউ স্যাকরা ডেকেছে, স্যাকরা মাপ নিয়েছে, দরদাম হয়েছে। সে-সব কিছুই আমার মনে নেই। যেন, ও যখন বসিয়ে দিলে বসে থাকতে পারে, বসে-বসে নিজে-নিজে একটু-একটু দুলতেও পারে, হাততালি দিয়ে তাতিয়ে দিলে দুলতে-দুলতে গড়িয়ে পড়তেও পারে, নিজের গলা দিয়ে নানারকম আওয়াজ তৈরি করতে পারে, সেগুলো সব হাসির আওয়াজ, তখন ওর কোমরে রুপোর অমন ঘের যে-নিমফল তা পরিয়ে না দিলে, ওর দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে ঝুম-ঝুম শব্দ বাজবে কী করে আর নিজের শরীর থেকে নির্গত সেই শব্দে ও আরো দুলে উঠবে কী করে। আজ যখন বসতে পেরেছে, বসে দুলতে পারছে, কালই তো হামা টানবে। আর সেই হামাটানার সময় ওর কোমরের পেশি যত দুলবে ও ততই ছুটবে, আর কোমরের ঘুঙুর ততই

বাজবে। কোমরে সেই নিমফল বেঁধে, মাথার চুল চুড়ো করে, ওকে দাঁড় করানো হত, তখন যা দেখাত! ও কি নিজেকে দেখতে পেত? কেমন করে পারবে? মেয়েরা অবিশ্যি ওকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিত আর ও তখন নিজেকে আয়নায় দেখে কলকল করে উঠে দাঁড়ানো থেকে লাফাতে চাইত। সে কী নাচন তার। পেছন দিকে নিমফলের বেড় একটু উঁচুতে আর সামনের দিকে তলপেটের তলা দিয়ে। 'নাচে নাচে মোহন নাচে, নাচে নাচে গোপাল নাচে, নাচে নাচে মোহন নাচে', আর আয়নার সামনে নিজের নাচ দেখে তার সে কী বিভোর নৃত্য। ঘাড় যে তখনো পুরোপুরি শক্ত হয়েছে, তা নয়। মোটামুটি সামনের দিকে তাকাতে পারে, তাকিয়ে থাকতে পারে। ডাইনে-বাঁয়ে একটু-আধটু ঘাড় ঘোরাতে পারে। তেমন বেশি করতে গেলেই টলে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারে না। শুয়েই থাকে। ঘুম থেকে জেগে উঠলে গড়িয়ে উপুড় হয়ে আবার উপুড় থেকে চিত হয়ে যায়। ওটুকু ওর নিজের কেরামতি—বিছানায় গড়াগড়ি দেয়া। ভয়ও তাতেই ছিল বেশি—গড়াতে-গড়াতে কখন আবার বিছানা থেকে পড়ে না যায়!.

চব্বিশ

ততদিনে ও চোখে চোখ মেলাতে পারে। ততদিনে ওর দুচোখে, ও যেদিকে চাইছে তার প্রতিফলন ঘটে। ততদিনে ও যেদিকে চায়, সেদিকটা ওর নতুন চোখের নতুন চাউনিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে। যেন ও শুধু দেখে না, ও আলো ফেলে, ওর চাউনির আলো। সে-আলোতে যখন তুমি একেবারে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ মাখামাখি করে নিতে চাইছ, তখনই ও একেবারে আচম্বিতে, প্রত্যাখ্যানের জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হওয়ার একটুও সময় না দিয়ে, চোখ সরিয়ে নেয়। যেন ও চেনে, সবাইকেই চেনে, কিন্তু কাউকেই খুব বেশি চিনে নিতে চায় না। আমাকে কি একটু বেশি চিনে নিয়েছিল? ঐ যে বুকে মুখ দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর অন্য স্তনে হাতদুটো মেলে রেখে দেয়—সেটাই কি ছিল একটু বেশি রকমের চেনা, একটু অন্যরকমের চেনা? স্তনটা তো ওর কাছে খাওয়ার উৎস। অন্য মেয়েদের স্তনের দিকেও ঠোঁট বা হাত বাড়াত। এই একজনের স্তনেই যে ও মুখ দিতে পারে আর এই স্তন-শোষণে তার অধিকার যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন—এই কথাটা বুঝেই কি ও আমার মুখের দিকে তাকাত? অমন তাকাত? স্তন্যপানের সময় ঘামতে-ঘামতে অমন তাকাত? আর হাসত। সে-হাসিটা দেখেই বোঝা যেত অন্যরকম হাসি। এমন

চেনা হাসি ছড়িয়ে দিত ও সারা মুখে, যেন বলতে চাইত —আমি তো নিজেকে নিয়েই হাসি, শুধু তোমার দিকে চাইলে আমি অন্য হাসি হাসি। এতদিন কান্না ছিল ওর একমাত্র ভাষা। এখন থেকে হাসি হল ওর দ্বিতীয় ভাষা। একটু বোধহয় তফাৎও ছিল। কান্না ছিল ওর তখনকার ভাষা, যখন ও নিজেকেও চিনত না, দেখতে পেত না, বুঝত না। হাসি হল ওর তখনকার ভাষা, যখন ও নিজেকে দেখতে-চিনতে শুরু করেছে, অন্যদেরও দেখতে-চিনতে শুরু করেছে। সামনে কেউ না থাকলেও ও হাসত, সেও তো ছিল তার চারপাশের সঙ্গে হাসাহাসি। কেউ আর-একজন কোথাও আছে, এটা না বুঝতে, না জানলে, কেউ হাসতে পারে না। কাঁদে মানুষ একা-একা। তখন, সেই যখন ওর এই বাল্য আর গোষ্ঠ কোন অতীতে চলে গেছে, যখন ও ওর প্রবাসে প্রবেশ করেছে, সেই প্রবাস কোন এক মায়ায় যখন ওকে অসূর্যের দেশে নিয়ে গেছে, তখনও কাঁদত, কেবল কাঁদত। কান্নার প্রতিধ্বনি নেই জেনেও কাঁদত। আর এই হাসি ছিল ওর জীবনের পুরাকালের।

পঁচিশ

তখন তো আর ওর শুধু বুকের দুধে চলে না। ওকে অন্য সব কিছুই খাওয়াতে হত। খেতও বেশ জিভ বের করে-করে। যেটা ভাল লাগত না, সেটা ঠোঁটে ছোঁয়ালে ঠোঁট খুলত না। কেন ভাল লাগত না, সে বুঝব কী করে ? একদিন ভাল লাগল, আর-একদিন ভাল লাগল না ? নিজে জিভের উপর দু-এক ফোঁটা ফেলে বুঝতে চাই—স্বাদের কোনো হেরফের হয়েছে কী না। দু-এক দিন ধরাও পড়ে, চিনি দিতে ভুলে গেছি। 'দেখেছ ! ছেলের কী জিভ হয়েছে, চিনি দেয়া হয়নি বলে ঠোঁট খুলবে না ?' চিনি মিশিয়ে ঠিক করে দেয়ার পরও যে ঠোঁট খুলবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আবার একটু অন্যমনস্ক করে নিলে খুলতও ঠোঁট। খেয়ে নিত। আমার তো মনে হয়, ওর আর বুকের দুধের তখন তেমন দরকারও ছিল না। যদি ধীরে-ধীরে বুকের দুধ কমিয়ে দেয়া যেত, তাহলে বন্ধও হয়ে যেত বোধহয়। ততদিনে ওর তো আবার একটা বাইরের খেলাও হয়েছে। মুখ চেনা হয়েছে, কোল চেনা হয়েছে, গলা চেনা হয়েছে, হাসি চেনা হয়েছে। সেই সব চেনাচেনি ঘোরাঘুরি শেষ করে যখন কোলে শুয়ে বুকে মুখ দিত, তখন ওর বোধহয় কেমন একটা ফিরে আসার ঘটনা ঘটত, বা সেও ছিল ওর ভিতরের খেলা। বাইরেটাকে ও ততদূরই চিনে নিয়েছিল, যতদূর গেলে ভিতরটা বাইরে চলে আসে না, ভিতরটা ভিতরেই

থাকে। তখন ওর ভিতর ছিল বলেই, বাইরেটা ছিল। ও হামা দেয়নি। বসলে যখন আর টলে পড়ে যেত না, বসে-বসেই ও যখন এদিক-ওদিক কোমর ঘোরাতে পারত, পেছনটাও দেখতে পারত, অর্থাৎ, ওর বসাটার যখন বেশ শিকড় গজিয়েছে, তখন ও বসে-বসেই এক পা উঁচু করে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে এগিয়ে যেত। সেটাকেই আবার কয়েকদিন পর বদলে নিয়ে ও এক পায়ে হামাগুড়ি দিত। দুই হাত মাটিতে থাকত অথচ হাঁটুদুটো মাটি ছুঁত না। একটা পা বসার ভঙ্গিতে রেখে, আর-একটা পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে বেশ তরতরিয়ে এগিয়ে যেত। যখন যেটা ও করে ফেলতে পারত, তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ও পরের ধাপে ঢুকে যেত। হাত-পা বাড়ানো জানল কী জানল না, পাশ ফিরল। পাশ ফিরতে পারল কী পারল না, গড়াগড়ি খেল। বসতে পারল কী পারল না, লেংচে-লেংচে এগতে লাগল। তখনও একা-একা শোয়া থেকে বসতে পারে না। অথচ কোনো একদিন একটা টেবিলের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে উঠে ধপাস করে পড়ে গেল।

ছাব্বিশ

পড়ে যাওয়া মানেই তো—হল, এখন ঐ টেবিলের পায়া ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চলবে আর পড়া চলবে। পড়ে গিয়ে কখনো যদি ব্যথা পায়, তাহলে তারস্বরে কেঁদে উঠবে, মুখ দরজার দিকে ঘুরিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে-ফুলিয়ে, ব্যথা তেমন জোরে লাগলে, দুচোখে জল ঝরিয়ে। কেউ ছুটে এসে কোলে তুলে নিলে, কান্নাটা এক গমক বেড়ে ধীরে-ধীরে নেমে যেত, থেমে যেত। আর একটু পরে, কেন কেঁদেছিল সেটাও ভুলে যেত। আমি তো এই সারাটা জীবনে মাত্র একটি ছেলেরই মা হয়েছি। মাত্র একটি ছেলের মা হয়ে কি জানা যায়, বোঝা যায়, বাচ্চারা কখন কী কেন করে? তাও আবার আমি এমনই এক ছেলের মা, যে, তার একমাত্র ছেলেকেও নিজের আয়ুর চাইতে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। সেদিক থেকে তো আমি গান্ধারী—এক ছেলেকেও বাঁচিয়ে রাখতে না-পারার যে-কলঙ্ক, শতপুত্রের একটিকেও বাঁচিয়ে রাখতে না-পারার সেই একই কলঙ্ক। ছেলেগুলো কেমন পর হয়ে যায়, দূরের হয়ে যায়, অজানা হয়ে যায়। কী করে হয়? অথচ ও নিজেও যখন নিজেকে বুঝত না, জানত না, চিনত না, তখন, এক আমিই তো ওর সব বুঝতাম, স—ব। ওর খিদেতেষ্টার কথা বলছি না। আমার শরীর দিয়ে যে খিদেতেষ্টা মেটে, তা আমি বুঝব না তো কে বুঝবে? সেটা আর কী এমন বড় কথা? কিন্তু আমি যে জেনে

গিয়েছিলাম, ওর যখন যেটাতে চোখ, তখন সেটাতে ওর সর্বাঙ্গ লেগে যায়, আর-সব কিছু ভুলে যায়। আর, সেখান থেকে যখন ও চোখ সরিয়ে নেয় তখনো ওর সম্পূর্ণ বিস্মরণ। নিজেকে সম্পূর্ণ করে দেয়া আর নিজেকে নিঃশেষে প্রত্যাহার করা—তাকে কী সন্ন্যাসও বলে? সেই সন্ন্যাস কি শিশুর জন্মগত আর সেই সন্ন্যাস ভুলে সংলগ্নতাকেই কি বড় হওয়া বলে? কারো যদি এমন সর্বনাশ ঘটে যে বড় হলেও তার সন্ন্যাস ঘোচে না? তখন, সে সেই অসূর্যের দেশের ভিতর থেকে ভিতরে যেতেও ভয় পায় না। ভয় মানে তো আমার বর্তমানকে হারাবার আশঙ্কা। যার বর্তমানই নেই, সে আর হারাবে কী? সে তার নিজের শ্বাস নিজেই রুদ্ধ করতে পারে। আর তার হতভাগিনী মা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকা এমনই এক অপরিত্যাজ্য প্রক্রিয়া, মৃত্যুর স্মৃতিও যার অবলম্বন হতে পারে। ও আবার সেই টেবিলের কাছে ফিরে গিয়েছিল, পায়া ধরে দাঁড়িয়েছিল, পায়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে টলটল করছিল, একটা-দুটো পা ফেলতেও পেরেছিল।

সাতাশ

ওর চলার কথার শুরু থাকতে পারে, শেষ থাকতে পারে না। ওর বেলায় অবিশ্যি এই সূত্রটা খাটেনি। ওর চলা ও নিজেই থামিয়ে দিয়েছিল। সেই থামিয়ে দেয়ার জন্যে ওকে কত অন্য পথে অন্য ভুবনে অন্য কক্ষে ঘুরতে হয়েছে তার অনুমান আমার পক্ষে কি করা সম্ভব? কারো পক্ষেই কি করা সম্ভব? কারো পথই তো আগে থেকে তৈরি থাকে না। সবাই পায়ে-পায়ে নিজের পথ তৈরি করে নেয়। আর এ-রহস্য কে দূর করবে, কে কোন পথে গেল! কতবার ও টেবিলের পায়া ধরে দাঁড়াল, হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, ধপ করে বসে পড়ে কেঁদে উঠল, পায়া থেকে দুহাত সরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কেমন স্থাণু হয়ে গেল—না পারে টেবিলের পায়া আবার ধরতে, না পারে মেঝের ওপর বসে পড়তে, না পারে ঘাড় ঘোরাতে। নিজের সেই সামগ্রিক ব্যর্থতায় কেঁদে উঠল, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই। শেষে, টেবিলের পায়া, দেয়াল, খুঁটি, দরজা, চেয়ার যা ধরা যায় তাই ধরেই দাঁড়িয়ে উঠে, সেটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, না-কেঁদে দাঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই একটু ঘুরে তাকানো, তাকাতে গিয়ে পড়ে যাওয়া, পড়ে গিয়ে আবার দাঁড়ানো ও আবার দু হাত মুক্ত করে নেয়া ও আবার একটু ঘুরে দাঁড়ানো, একটা পা সামনে ফেলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আকাশ ভাঙা রবে কেঁদে ওঠা, তারপর

সেই দাঁড়ানো আর ঘোরা আর পা ফেলা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া, তার পরদিন বা তারও পরদিন, আবার সেই দাঁড়িয়ে ওঠা, হাত ছেড়ে দেয়া, ঘুরে দাঁড়ানো ও একটি পা ফেলা ও পড়ে না গিয়েও কেঁদে ওঠা, কারণ, ও নিজেকে আর পুরনো কোনো অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না, সে-কান্নাও ভুলে যাওয়া, আবারও সেই দাঁড়িয়ে উঠে হাত ছেড়ে দেয়া আর এক পা ফেলা। এমনি করেই দুই পা ফেলা। তিন পা ফেলা। মানব অভিযান শুরু হয়ে যায়, দূরতর দূরত্ব প্রতিদিন লুঠ করে আনে। কারা দুই হাত মেলে ধরে ডাকে, 'আয়, আয়, আসে, আসে'। সেই আহ্বানের ওপর সর্বস্ব পণ করে ও ছুটে যায়, ওর ছুটে যাওয়ার শক্তির সীমান্ত অবধি। এ কী আত্মবিশ্বাস? নাকী এ সবাইকেই বিশ্বাস? নাকী এ এক বিশ্বাসের ভুবন নির্মাণ। প্রতিটি পর্যটনের শেষে, প্রতিটি লক্ষে পৌঁছুবার শেষে ও নিজেই নিজের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠতে চাইত অথচ জয় যে ইতিমধ্যে নিশ্চিত ঘটে গেছে তা বুঝতে না পেরে, যে ধরত তার বুকে বা কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলত। মুখ তুলেই ও প্রত্যাবর্তন শুরু করত, কোনো ক্ষান্তি ছিল না।

আটাশ

তখনই বোধহয় ওর জীবনের সেই ঋতু এল, যখন নাম ঝরে পড়তে লাগল ওকে ঘিরে, নাম ফুটে উঠতে লাগল ওর পায়ে-পায়ে, নাম দুলতে লাগল ওর বুকে, নামের ছোট-ছোট ঢেউ ওর চলার পেছনে ভেঙে যেতে লাগল, ওর ঘুমকে ঘিরে রাখল নামের বলয়। দেবতাদের অষ্টোত্তরশতনামের প্রতিটি নামের পেছনে এক-একটি পুরাণ থাকে। আর, ওর প্রতিটি নামের পেছনে ছিল যে-ডাকছে, তার এক অজ্ঞেয় উল্লাস, সে কতকগুলি ধ্বনিকে অর্থ দিতে চাইছিল ওকে ঘিরে, সে কতকগুলি অর্থকে ধ্বনি দিতে চাইছিল ওকে ঘিরে। আর ও-ও তো তখন গলা দিয়ে, ঠোঁট দিয়ে নানা রকম সব ধ্বনি বের করতে পারছে। ও-ও তো তখন ওর চারপাশকে এমন সব নামে বোঝাতে চাইছে, যে-নাম ইতিপূর্বে কখনো আর ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বয়োজ্যেষ্ঠ কে ওকে ডাকতেন 'বোকলা' বলে। এটা তো মুখোমুখি কোনো ডাক ছিল না, ছিল দূর থেকে ডাক। ফলে নামটা তুচ্ছ হয়ে যেত ডাকের কাছে। বহু সন্তানের জননী ওঁকে ডাকতেন 'বুরু'। সে-আহ্বানে কোনো দূর ছিল না। 'সোনা' ডাকত যারা, তার যেন কোনো আভাস-ইঙ্গিতে যেতে চাইত না, 'সোনা' মানে সোনা। সেরকম করেই কেউ ডাকত 'মুন্না'। 'মনা'—গলাটা কেমন খাদে নেমে যেত।

একজন, একজনই ওকে ডাকতেন, 'বাবু'। যে-আনুগত্য গ্রহণ করে না, তাকেই আনুগত্য জানাতে মন চায়। তখন, সেইসময়, খনির গভীরতা থেকে পর্বতসানু পর্যন্ত একটি বাংলা ডাক কী অব্যর্থতায় ছড়িয়ে পড়েছিল, কী নিদারুণ ব্যথায়, 'পা-গ-ল ভা-ই'। সেই স্মৃতিতে কারা ওকে ডাকত 'পাগল'। কারা দূর থেকে ডাকতে-ডাকতে আসত—'ভাই'। কোনো এক বয়সিনী তাঁর ডাকের মধ্যে পুরাণ ভরে দিতেন, 'একে ছেলে বলেছে কে? এ তো চন্দ্রবলী।' সবাই তো কত ধ্বনি, কত শব্দ, কত অর্থ, উজাড় করে দিত। আমি ওকে কিছুই ডাকতাম না। খুব গভীর রাত্রিতে ও যখন নিশ্ছিদ্র সেই ঘুমের ভিতরে থাকত, যে-ঘুম এক শিশুই ঘুমতে পারে, আর আমার বুক ভারী হয়ে উঠত, তখন আমি ওর বুকে মাথা হেলিয়ে ওর হৃদস্পন্দনের ধ্বনি শুনতে-শুনতে ডাকতে চাইতাম, 'প্রাণ'। আমি কি আশ্রয় চাইতাম, আমার সব অক্ষমতা থেকে আশ্রয়? 'প্রাণ'। নাকী আমিই ওকে আশ্রয় জানাতাম, ওর দীর্ঘতম আয়ুর আশ্রয়, 'প্রাণ'? অথবা সেই গভীর, স্বগত, অনুচ্চার আহ্বানে আশ্রয়-আশ্রিতের কোনো ভেদ থাকত না। 'প্রাণ'।

ঊনত্রিশ

ও কাকে কী নামে যে ডাকত আর কখন ডাকত, তা হঠাৎ কোনো এক সময় বোঝা যেত, কোনো-কোনো পাখির ডাক যেমন সহসা শোনা যায়। কোন এক বর্ষিয়সী স্নানের জল ঢালতেন 'গঙ্গা-গঙ্গা' বলে। জলের ধ্বনিকে যে ও 'গঙ-গঙ' বলে ডাকে তা বোঝা গেল একমাত্র তখনই, যখন, ওর মাথায় জল ঢাললেও ও 'গঙ-গঙ' বলে উঠত। কোনো একজনের দিকে ও 'লা-লা-লা' বলে ছুটে যেত। বোধহয় তাঁর নামের কোথাও 'ল' ছিল। আর ছিল দুই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বস্তুনিরপেক্ষ ডাক, 'দ্-দ-দ্-দ-অ', 'দি-দি-দি-দি-ই'। তারাও 'দ-দ্-ও', গাছও 'দ-দ-ও', মাথার চুলও 'দি-দ্-ই', গানও 'দি-দঁ-ই', কাকও 'দি-দ্ই' চাঁদও 'দ-দ্-ও' ভাতও 'দি-দ্-ই'। এত চলন হয়ে গেছে ওর, এত ডাক এসে যাচ্ছে ওর কাছে, ও কত ডাকছে, ও কত দেখছে, ও কত নাম দিচ্ছে— ওর তো এক বাহির দিনে-দিনেই বাড়ছে, বাড়ছে, বাড়বে, বাড়বে। ও আমাকে একদিন, এতদিন, ওর ঐটুকু মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে, এবার বিশ্ব ওকে দেখতে চাইবে। চাইছে। এই ত্রিভুবন কি আর-কোনো আঙিনা পেল না, এই আমারই আঙিনায় এসে গোষ্ঠে যাবার ডাক দিল? এত দিন কি এই ধেনুদল গ্রামের বাইরে গোচারণের মাঠে গিয়ে কচি ঘাস খেয়ে আবার ঘরে

ফিরে আসেনি? আমি কাকে বোঝাই, কাকে জানাই, আমার বুকে হাত দিয়ে কাকে দেখতে বলি, 'তোমরা আমার বুকের মধ্যে দিগন্তে মেঘের দুরুদুরু শুনতে পাচ্ছ না? গোষ্ঠের ডাক তো প্রবাসের প্রথম ডাক। এ ডাকে সাড়া দিয়ে ও যখন ধেনুদল নিয়ে যাবে, তখন ও ফিরেও আসবে। তোমরা জানো না, আমি জানি, এই গ্রামসীমার মধ্যেই গমনাগমনে তোমরা যখন অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন একদিন ধেনুদলের প্রত্যাবর্তনের গোধূলি, আর ওর গ্রামসীমালঙ্ঘনের পদপাত ধূলি দুই বিপরীত দিকে চলে যাবে। ও আর তোমাদের গৃহপালিত গাভীদের দোহন দেখতে ফিরে আসবে না। ও এক অগৃহবাসের দিকে নিজেকে ঠেলে দেবে, বাতাসের মুখে আমের মুকুলের মত, স্রোতের মুখে পাথরের মত। তোমরা সবাই আমারই আঙিনায় এসে ওকে নিয়ে উৎসবের আর গোষ্ঠের গান গাইতে শুরু করলে? তোমরা শুধু এটুকুই দেখলে যে ও কোমরে আর কপালে লালনীল কাপড় বাঁধার মত মাথা চাড়া দিয়েছে। তোমরা কেউ দেখলে না, ওর যে পায়ের তলায় তিল, ওকে ঘরে থাকতে নেই।'

ত্রিশ

আমি কোনো দিব্যি দিয়েছিলাম, তোকে, বেশি দূরে না যেতে, বেশি দূরের গোষ্ঠে না যেতে, আমার কাছাকাছি যদি না-ই থাকিস, অন্তত তোর গলার স্বর যেন শুনতে পাই, এমন দূরত্বের বেশি না-যেতে? বাতাসের ওপর ভরসা করেছিলাম, তোর গলার স্বর বয়ে আনবে বলে? তোকে কি সবার আগে-আগে যেতে নিষেধ করেছিলাম? আমি কি চেয়েছিলাম, সেই রাখালদলের মধ্যে তুইই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় থাক? কিন্তু আমি কী করে জানব, সেই ধেনুদলে-রাখালদলে কোন জায়গাটি নিরাপত্তম? আমি কি তখনই জানতাম পথের কুশের কাঁটা তোর নরম পায়ে বিঁধবে? আমি কি মেনেই নিয়েছিলাম তখন, গোষ্ঠযাত্রা তোর বৃত্তি ও ব্রত, বৃত্তি বা ব্রত? আর তা থেকে তোকে বিরত রাখার কোনো অধিকার বা শক্তি আমার ছিল না। কে অধিকার দেবে আমাকে? অধিকার দেয়ার কর্তা কে? আর, কাউকে বৃত্তি বা ব্রত থেকে কি ভ্রষ্ট করা যায়? আমি তো জানি, তেমন করলে তোর অপুণ্য হবে—বৃত্তিভ্রষ্ট বা ব্রতভ্রষ্টের অপুণ্য। সে-অপুণ্যে আমি কী করে তোকে ঠেলে দেব? কোনো কী উপায় ছিল, তোর সব অপুণ্য আমি মেনে নিতাম, ভ্রষ্টতার অপুণ্য আমার ওপর বর্তাত, সেই অপুণ্য স্বীকার করে আমি এই গৃহবাস ছেড়ে, সংসার ছেড়ে,

কোনো নিরুদ্দেশে হারিয়ে যেতাম, শুধু তুই ঘরে থাকতি? তেমন সব উপায়ের কথা এখন মনে পড়ে। আসলে, তেমন কোনো উপায় কখনো থাকে না, কখনো ছিল না। খুব ঠাণ্ডা লম্বা বিকেলে, যখন কোথাও রোদও থাকে না, ছায়াও থাকে না অথচ বিকেলটা ছড়িয়ে থাকে দূরের সব বড়-বড় গাছের পাতায়, মাঠে, পাখিদের ঘরে ফেরার আওয়াজে, শিশুদের খেলায়, গরমের দিনের তেমন অফুরান বিকেলে এই অনেক দিনের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কেমন মনে পড়ে, আমি তো গোষ্ঠ থেকে বাঁচাতে যা যা করার, সবই করেছিলাম। তোর বাঁ কপালে কাজলের টিপ দিয়েছিলাম, কারো নজর যাতে না লাগে। তোর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল একটু ব্যথা দিয়ে কামড়ে ছিলাম, তোর মন যাতে না পোড়ে। আমার তো আর-কোনো বর্ম তোকে পরাবার ছিল না—ঐ তো ছিল আমার সর্বস্ব, তোর কপালের কোণে আমার দেয়া টিপ, তোর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে আমার দেয়া ব্যথা। সেই তো শুরু—তোর প্রবাসের। কে জানত, তোর গোষ্ঠ আর ঘরের মধ্যে সাত সমুদ্রের প্লাবন ঢুকে পড়বে?

একত্রিশ

আর, আমার রইল এই বিশ্ব। এই এত বড় একটা পৃথিবী নিয়ে আমি একা কী করব? সেই বড় থেকে বড় পৃথিবীটা তোকে নিশ্চিহ্ন করে নিল। পৃথিবীটা যে এই পৃথিবীর চাইতেও বড় হতে পারে, তা তো তুই একদিন দেখিয়েছিলি, আমাকে? দেখিয়েছিলি নাকী? নাকী আমিই দেখেছিলাম? নাকী আমিই ভেবে নিয়েছিলাম? যে-তুই আমার বুকে থাকিস, সে-তুই কি শুধু আমার বুকটুকুতে থাকতে পারিস? যে-বুকে তোকে ধরি তা কি অতটুকুন হতে পারে? আমার এতই গরব যে সারা দুনিয়াটাও যেন তোর পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভাবতাম। অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। আমার ঐ গরবই কি আমার কাল হল? অতি বড় বিয়স্তী না পায় পুত। তার চাইতে তোকে আমি কারো কাছে এক মুঠো খুদের বিনিময়ে বেচে দিলাম না কেন? আমার কপাল তাহলে তোকে ছুঁত না। আর কে জানে, তুই যদি সেই আর-এক জনকেই 'মা', 'মা', বলে ডাকতি, তাহলে আমিও হয়তো একটু আলগা হয়ে যেতে পারতাম। আলগা হয়ে যেতাম। সে, তোর সেই আর-একটা মা, তোকে হয়তো, আর-একরকম করে বাঁচিয়ে রাখতে পারত। পারত কী পারত না, তা জানি না, একেবারে স্বার্থপরের মত ভাবছি, আমি হয়তো তাতে বেঁচে

যেতাম, আমাকে হয়তো তাহলে এখন এমন করে অফুরন্ত বিকেলের এমন ছায়াভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তোর মুখটুকু মনে আনার অবশ চেষ্টা করে যেতে হত না। আমি যে চেষ্টা করি, তা-ও নয়, কখন এক সময় বুঝতে পারি, এই এত বড় আকাশের সেই কোন এক দিকে তাকিযে তোর মুখটাই খুঁজছি। টেব পেয়েই, তাড়াতাড়ি মনটাকে সরিয়ে নিতে চাই—ছ্যাঁকা লাগলে যেমন চমকে নিজের অজান্তেই হাত সরাই। সেই সরিয়ে নেয়াটুকু তো শবীরের অভ্যাস। তারপরই ফিরে যাই, আগুনে, সারা শরীব ধবে জ্বলে ওঠা আগুনে। ঐ মুখটুকু থেকেই যদি সবে আসি, তবে আব আমার চোখ জুড়ে রইলটা কী? রইবেটা কী? কে ভুলতে চায়? কী ভুলতে চায়? আমি তো আরো সবল স্মৃতি চাই। যে-স্মৃতি তোকে পুঙ্খানুপুঙ্খে তৈরি করে ফিরিয়ে দেবে। তুই তোর মুখবিবর বন্ধ কব। ও-বিশ্বরূপ আমার বিশ্বের নয। তুই আমাকে তোর মুখমণ্ডলটুকু ফিরিয়ে দে। সেইটুকুই তো ছিল আমার বিশ্ব। তোর মুখটুকু, যে-মুখ আমার দুই কবতল ছাপিয়ে যেত, যে-মুখ আমাব বুকে পাপড়ির মত খুলত।



প্রেতলোক

এক

এই, এইই প্রেতলোক। এই, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে। এখানে পৌঁছুতে আমাকে দীর্ঘ, দী—র্ঘ, দীর্ঘ বছর হাঁটতে হয়েছে। কত আয়ু হাঁটলে সে-হাঁটার শেষে যেখানে পৌঁছনো যায়, তাকে প্রেতলোক বলা যায়? এক সময় ছিল, যখন মানুষের সম্মুখ থেকে সূর্যোদয় ঘটত ও মানুষের দীর্ঘতর ছায়ার পাদমূলে সূর্যাস্ত ঘটত। এক সময় ছিল, যখন মানুষকে ছায়াহীন চন্দ্রিমায় আভাময় করে চন্দ্রোদয় ঘটত ও মানুষের সুপ্তি অব্যাহত রেখে চন্দ্রাস্ত ঘটত। তখন, সূর্য এক রাশি থেকে আর-এক রাশিতে প্রবেশ করত ও এক রাশি থেকে আর-এক রাশির দিকে নিষ্ক্রমণ করত ও এক-এক রাশিতে কিছু সময় অবস্থান করত। এক সময় ছিল, যখন চন্দ্রের এক-এক কলা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এক-একটি তিথি মানুষকে এক সময়জ্ঞান জ্ঞাপন করত আর মানুষ

একটি পূর্ণচন্দ্রে সেই সময়ের পূর্ণতা পরিমাপ করত। আবার, এক-এক কলা ক্ষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে এক-একটি তিথি মানুষকে সময়জ্ঞান জ্ঞাপন করত আর মানুষ, একটি পূর্ণ অন্ধকার দিয়ে সেই ক্রমান্ধকারের পরিমাপ করত। তখন, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, রাশি, নক্ষত্র, চন্দ্রকলা ও নীল ও অন্ধকার আকাশ দিয়ে নিজের আয়ুর চংক্রমণের হিশেব রক্ষা করতে পারত। সেই হিশেব অনুযায়ী মানুষ নিজের আয়ুর কোন ভাগে কী কর্ত্ব তার পূর্বজ্ঞান আয়ত্ত করত, বা, মানুষ জীবনযাপনের সেই নির্ধারিত কর্ত্বসূচির কক্ষপথে নিজেকে স্থাপন করত। সূর্যের কক্ষপথ, চন্দ্রের কক্ষপথ, নক্ষত্রের কক্ষপথের সঙ্গতিতে মানুষের নিজের কক্ষপথ নির্ধারিত থাকত। সকল মানুষের জীবনযাপনে নির্মিত সেই কক্ষপথে মানুষের ব্যক্তিগত ও পৃথক কোনো গতি ছিল না। মানুষ আরো অজ্ঞাত সত্য ও পূর্ণতার সন্ধানে সেই সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-আকাশ-আলো-অন্ধকারের কক্ষপথের সঙ্গতিতে রচিত কক্ষপথ ত্যাগ করেছে। তখন, সেই কোনো এক কালে, মানুষের কোনো কবি মানুষের পূর্বনির্ধারিত আয়ুর অনুপাতে, নিজের জীবনের মধ্যভাগ স্থির করে নিতে পারতেন ও যদি তিনি তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যকালে পথ হারিয়ে গভীর কোনো বনে দিশেহারা হয়ে পড়তেন, তাহলে মানুষেরই প্রাচীনতর কোনো কবি, তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দিতেন, তাঁর হাত ধরে এক অভাবিত অভিযানে তাঁকে নিয়ে যেতেন। মানুষ তার আয়ুষ্কালের হিশেব ধ্বংস করেছে, মানুষের জীবনযাপনের আর-কোনো কর্ত্বসূচি নেই। তাই আমার করাঙ্গুলিতে কোনো চিহ্ন নেই যা গুনে-গুনে আমি বলতে পারি, কত দীর্ঘ হেঁটে-হেঁটে আমি এই প্রেতলোকে পৌছেছি। এই প্রেতলোক। এই। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে।

দুই

প্রাচীনতর কোনো কবি এই প্রেতলোকে আমাকে পৌছে দেন নি, আমার হাত ধরে এই প্রেতলোক পার করে দেননি। অন্য কোনো দেবদূতের হাতে আমাকে তুলে দেননি। এক সময় ছিল, যখন মানুষের এই ভ্রমণের এক সূচি অন্য কোনো কার্যপরম্পরায় তৈরি হয়ে যেত। সে এক সময় ছিল, যখন প্রেতলোক ছিল দিব্যলোকে যাবারই এক অনিবার্য পথ। মানুষ তার সেই ভ্রমণসূচি ত্যাগ করেছে। মানুষ নিজের জন্যে কোনো শুদ্ধিলোক ও দিব্যলোকের লক্ষ রক্ষা করেনি। ভ্রমণসূচিহীন, কর্ত্বসূচিহীন মানুষ তাই এমন কোনো অভিযানে

নিজেকে আর নিয়োজিত করতে পারে না, যে-অভিযানে প্রাচীন প্রবীণ তাকে তাঁরই এক সময়ের পরিক্রমণাস্তিক পথে, তাঁরই কোনো বংশধরকে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারেন। মানুষ যত নতুন-নতুন পথ খনন করেছে, সে ততই তার পূর্বপুরুষদের পরিক্রমণের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ প্রাচীন সব পথ ত্যাগ করেছে। মানুষ তার নিজের জন্যে আর-কোনো প্রাচীনতা রক্ষা করেনি। যে-সব জ্ঞানচিহ্ন ধরে-ধরে মানুষ নক্ষত্রলোক, ইহলোক, পরলোক, ভবিষ্যলোক চিনে-চিনে নিতে পারত, এখন, মানুষের যাত্রাপথের দুপাশে সে-সব জ্ঞানচিহ্নের উৎপাটিত গাছগুলিও আর নেই। যে-পথে চিহ্ন থাকে না, সে-পথে পথও থাকে না। আমি জানি না, কোন পথ পার হয়ে আমি এই প্রেতলোকে পৌঁছেছি। এই প্রেতলোক। এই। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে।

তিন

মানুষ এক সময় নির্মাণ আয়ত্ত করেছিল, যে-নির্মাণের ক্ষমতা দিয়ে সে তার এই শরীরের বাধ্যতাকে এক দিব্যতায় পরিণত করে নিত। সে কোনো রসায়নে নয়, কোনো সংগঠনে নয়, কোনো মন্ত্রতন্ত্রে নয়। মানুষ শুধু অস্বীকার করেছিল —শরীরের ভিতর থেকে জেগে ওঠা যে-কামুকতা, তার দ্বারা, চালিত হতে। মানুষ তার শরীরকে ভেবে নিয়েছিল এমন এক প্রভু, যার আদেশ-নির্দেশ হয়ে উঠেছে অলঙ্ঘ্য। মানুষ সেই প্রভুত্বকে লঙ্ঘন করতে চেয়েছিল। তাই যে-নারী তার শরীরের প্রয়োজনে তার কাছে এক বস্তু হিশেবে পরিবেষিত হত, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়ের সঙ্গে, মানুষ সেই নারীকে ঈশ্বরেরও ওপরে স্থাপন করে এক দিব্যলোক তৈরি করে নিয়েছিল। সে-দিব্যলোক তার কাছে ছিল এমনই বাস্তবনির্মাণ, যে, রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির কূটকৌশলে নির্বাসিত এক মানুষের কবি, তাঁর নির্বাসনকে করে তোলেন সেই নারীর ভালবাসার কাছে পৌঁছনোর জন্যে এক প্রতীক্ষালয়। তাঁর জীবন হয়ে ওঠে সেই প্রতীক্ষারই এক আশ্রয়। তিনি তাঁর এই একই জীবন যাপন করতে-করতে নিজের সেই প্রেমের কাছে পৌঁছনোর জন্যে প্রতীক্ষাকেও সমান সত্য করে তোলেন। বা, হয়তো, জীবনযাপনের কোনো সত্যের চাইতে কিছু বেশি। তারপর মানুষ তার শরীরের আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। তাতে মানুষ আরো কত বেশি করে জানতে পেরেছে, শরীর কেন ও কী পদ্ধতিতে তাকে এতটাই বাধ্য করে ফেলে। মানুষ তার শরীরকে যত রহস্যহীন করে জেনেছে, মানুষ ততই শরীরের প্রভুত্বকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়েছে। মানুষ যতই নিজের

শরীরকে প্রভুত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার দায় ও প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে, মানুষ ততই নারীকে যে-ভালবাসার নাম দিয়েছিল সে প্রেম, আর যে-প্রেম তার এই শরীরকে অভিকর্ষের ভারমুক্ত করে দিয়েছে, সেই প্রেমকে নিজের বেঁচে থাকার এক প্রধান কারণ হিশেবে হারিয়েছে। প্রেম মানুষের শরীরকে যে-পুণ্য ও করুণা দিয়েছিল, সেই পুণ্য ও করুণা মানুষ ত্যাগ করেছে। পুণ্য ও করুণার অভিজ্ঞানলুপ্ত মানুষের দেহ তার নিজেরই কাছে এমন এক রহস্য হয়ে উঠেছে যে সে মানবসভ্যতায় সম্পূর্ণ অজানা মারকের জন্ম দিচ্ছে। আমি জানি না, মারকধ্বস্ত কোন পথ বেয়ে আমি এই প্রেতলোকে পৌঁছেছি। এই এখানে। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে। এই প্রেতলোকে।

চার

এক সভ্যতার ধ্বংসের পর আর-এক সভ্যতারচনার দায় প্রায় একই সঙ্গে মানুষের ওপর এক সময় বর্তাত। মানুষ নিজেই নিজের সেই দায় আবিষ্কার করত। বা, আবিষ্কারের ভিতর যে আকস্মিকতা থাকে, সেটুকু আকস্মিকতাও সেখানে ছিল না। এ যেন শীতে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার পর বসন্তে নবপত্রোদ্গম। একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করার মধ্যে যে-জয় নিহিত ছিল, সেই জয়ের ভিতরই নিহিত থেকে যেত আর-এক সভ্যতা নির্মাণের দায়। একই অজানা সমুদ্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিপদের মধ্য দিয়ে বিজয়ী বীর যেমন তার গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে সপ্তসিন্ধুমন্থন করতেন, তেমনি পরাজিত রাজপুত্র তাঁর বিজিত স্বদেশ ছেড়ে বৃদ্ধ পিতা ও শিশুপুত্রকে নিয়ে যাত্রা করতেন ভবিষ্যতের এক নির্মাণের প্রস্তুতিতে। মানুষের তখন উপদেশনার প্রয়োজন ছিল। তাই পরাজিত রাজপুত্র, সহায়হীন, সম্পদহীন, আয়োজনহীন ও মৃত্যুতাড়িত হয়েও তাঁর প্রথম কৃত্যরূপে বেছে নিতেন প্রেতলোকবাসী পিতার উপদেশ গ্রহণ। কী দুস্তর সেই সমুদ্র, যে-সমুদ্র পাড়ি দেয়ার তরণী থেকে কুচক্রী দেবতারা বিশ্বস্ততম বন্ধুকে হাল থেকে জলে ফেলে দেন। কী অনিশ্চিত সেই অবতরণ, যখন তাঁর জানা নেই কত নিকটজনের সমাধির দায় তাঁকে বহন করতে হচ্ছে! এত মৃত্যু, এত চক্রান্ত ও এত অসৎকারের দায় নিয়েও সে-রাজপুত্র শুধু পৌঁছুতে চান তাঁর প্রেতলোকবাসী পিতার কাছে, শুধু কিছু উপদেশনার জন্যে, শুধু কিছু আশীর্বাদের জন্যে, শুধু এটুকু জানতে —পিতৃলোকের সমর্থন থাকবে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচিতে, অথবা, সেই আশীর্বাদই গড়ে দেবে সেই ভবিষ্যৎ। মানুষ তার নিজের আবিষ্কারক্ষমতায়

ও নির্মাণক্ষমতায় এতই অন্ধের মত মুগ্ধ, যে তার আর পিতৃপুরুষের কোনো প্রয়োজন নেই, তার আর উপদেশনার কোনো প্রয়োজন নেই, তার আর আশীর্বাদের কোনো প্রয়োজন নেই। যে-আবিষ্কার ও নির্মাণ পিতৃপুরুষের দ্বারা নির্দিষ্ট নয় তা এক আপতিক আবিষ্কার। যে-আবিষ্কার ও নির্মাণ উপদেশনার দ্বারা শুদ্ধ নয়, তা এক অনধিকারিক আবিষ্কার। যে-আবিষ্কার ও নির্মাণ আশীর্বচনের দ্বারা শুদ্ধ নয় তা এক সংশোধনের অতীত আবিষ্কার। আমি জানি না আপতিক, অনধিকারিক ও সংশোধনাতীত কোন পথে আমি এই প্রেতলোকে পৌঁছেছি। এই প্রেতলোকে। এইখানে। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে।

পাঁচ

ঋতুসমূহের এক আবর্তনের মধ্যেই মৃত্যু অবধারিত—এমন অভিশাপগ্রস্ত সত্য জেনে, শুধু ভালবাসায়, শুধু ভালবাসায়, যমকে পরাজিত করতে পারব, এমন নিশ্চয়তাবোধ নিয়ে, যমকে অনুসরণ করে, আমি এই প্রেতলোকে এসে পৌঁছইনি। মানুষের ভালবাসার শক্তি মৃত্যুকে পরাজিত করার শক্তি হারিয়েছে। কারণ, মানুষ নিজের জ্ঞানকে হত্যা, আরো হত্যা ও আরো হত্যার কাজে ব্যবহার করেছে। মানুষ যখন জ্ঞানের শক্তি নিজেই আয়ত্ত করেছিল, তখনই সে তার নিজের ওপর এক নিষেধও জারি করেছিল। এই আহরিত ও আবিষ্কৃত জ্ঞান যেন কখনোই হত্যার ভিত্তি হয়ে না ওঠে। তারপর, মানুষ নিজেই নিজের সেই নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করেছে। যে-মানুষ নিজেই মৃত্যুর এক প্রধান কারণ হিশেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে, সে-মানুষ মৃত্যুকে পরাজিত করার শান্তি, শক্তি ও নিশ্চয়তা সংগ্রহ করবে কোথা থেকে? মানুষ দেবতার অনুগ্রহে মৃতকে পুনর্জীবিত করতে চায়নি। মানুষ নিজের ভালবাসার সত্যকে মৃত্যুর সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। মৃত্যু জীবনের চাইতেও নিশ্চিত। সেই মৃত্যুকে অনিশ্চিত করে দেবার জোর মানুষ নিজের ভিতর সঞ্চিত করে তুলেছিল বিন্দু-বিন্দু করে। তারপর সেই স্বোপার্জিত অমৃতত্বের শক্তি নিঃশেষ করেছে একবারে উগরে দিয়ে। যে-পৃথিবীতে শুধু মানুষেরই অধিকার, সেই পৃথিবীকে মৃত্যুর অধিকারভুক্ত করে দিয়ে, মানুষ তার নিজের ভূমি হারিয়েছে। নিজের বাঁচার ভূমি, নিজের জীবনযাপনের ভূমি, নিজের সেই ভূমি যেখানে সে তার উত্তরাধিকারীদের আঁতুড়ঘর তৈরি করে তুলতে পারে। হত্যার জ্ঞান, ক্ষমতা ও অধিকারের কাছে নিজের ভালবাসার শক্তি হারিয়ে

ফেলেছে যে-মানুষ, সে, সেই মর্তলোক থেকে এই প্রেতলোকে যমকে অনুসরণ করে আসার পথ মানুষের রক্ত দিয়েই মুছে দিয়েছে। যম যদি তাকে আজ তার প্রিয়তমের মৃতদেহ প্রত্যর্পণ করার জন্য দু হাত পাততে বলে, মানুষ সে-দুহাত পাততে পারবে না। তার ঐ দুহাতে জীবনগ্রহণের ক্ষমতা আর নেই। আমি জানি না, মানুষের রক্ত দিয়ে মুছে দেয়া ভালবাসার সেই ভুলে যাওয়া পথ খুঁজে না পেয়েও, হয়তো না-খুঁজেও, কী করে আমি এই প্রেতলোকে পৌঁছেছি। এই প্রেতলোকে। এখানে। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে।

ছয়

অথবা, আমাকে কোথাও যেতে হয়নি। এই প্রেতলোকে পৌঁছনোর জন্যে আমার কোনো যাত্রা ছিল না, এই দীর্ঘায়ু এক জীবনযাত্রা ছাড়া। সেই দীর্ঘ জীবনে আমি কোনোদিন ভালবাসাকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে দুর্গ করে গড়ে তুলিনি। যে-দুর্গ গড়াই হয় নি, সে-দুর্গের পতন হবে কোন দুর্ঘটনায়? আমি জ্ঞানকে হত্যার বিরুদ্ধে অলঙ্ঘ্য নিষেধ হিশেবে কখনো আকাশে তুলে ধরিনি, জয়ের ধ্রুব নিশ্চয়তায় সে-নিষেধ অনতিক্রম্য করার দৃঢ়তায়। যে-অস্ত্র তোলাই হয়নি, সে-অস্ত্র ত্যাগ ঘটবে কোন পরাজয়ে? আমি পিতৃপুরুষের উপদেশনায় আমার শ্রুতিকে ঋদ্ধ করে উত্তরপুরুষের শ্রবণে আমার স্মৃতিকে পৌঁছে দিইনি। যে- শৃঙ্খলা তৈরিই হয়নি, সেই শৃঙ্খলার সঙ্গতি নষ্ট হবে কোন আঘাতে? আর, তার পরিবর্তে, আমি আমার এই দীর্ঘ আয়ুপথের দুই ধার থেকে বাড়িয়ে ধরা অন্নহীন হাতগুলির ভিতর দিয়ে পথ করে নিতে-নিতে ভেবেছি, পরিত্রাণ। আমি মৃতদেহগুলির বিকার দেখতে-দেখতে ভেবেছি, শৈশব থেকে মানুষের বৃদ্ধির লালন। আমি কিশোরীর রক্তহীন হাতে জলহীন হাঁসকে ভেবেছি, জীবন। বুঝিনি, সেটা সহমরণ, মানুষ মরণেও সঙ্গী চায়। আমার এই কত না-দেখা, কত না-ভাবা, কত অপস্মার, কত বিকার, কত অজ্ঞতা দিয়ে ধীরে-ধীরে নির্ভুল মাপজোকে তৈরি করে তুলেছি এই প্রেতলোক। আমার দৈনন্দিনের বাইরে, আমার দৈনন্দিনের সমাহারের বাইরে, আমার প্রতিদিনের পথের বাইরে, এ-মুখ ও-মুখের দিকে আমার রোজ তাকাবার বাইরে, চোখ দিয়ে চোখের ভাষা পড়া ভুলে যাওয়ার বাইরে, কোথাও ছিল না, কোথাও ছিল না. এই প্রেতলোক। এই এখন যেখানে আমি দাঁড়িয়ে, সেই প্রেতলোক। আমি কি সহসা আবিষ্কার করেছি স্বপ্নের ভিতর

দিয়ে আমি এখানে পৌঁছে গেছি? নাকী, আমারই সন্তান বা ভাইয়ের আত্মনিধনেব ভিতর দিয়ে জেগে উঠল এই প্রেতলোক, তার জেগে ওঠার ঋতুতেই। সেই আত্মহত্যা তো ঘটে আসছিল, আমি আমার চোখ বন্ধ করে রেখেছি। আজ যখন সেই অন্ধ চোখ খুলছি, তখন আমি বুঝতে পারছি না, আমি প্রেতলোকের দ্বারে, না কেন্দ্রে, না পরিধিতে, এইখানে, এখন, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সাত

আমার যাত্রা নেই, কিন্তু তরণ আছে, এ কী অভিশাপ! দেখো, আমি আমারই প্রতিদিনকে তিল-তিল সঞ্চয় করে গড়ে তুলেছি এই প্রেতলোক আর এই এখানে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে, সেই প্রেতলোকের দ্বার, কিংবা কেন্দ্র, কিংবা পরিধি থেকে দু হাত বাড়িয়ে আমি কোন অন্ধকারের কাছে চাইছি, আমার সেই সন্তানের শব, যে নিজে অসূর্যের দেশে প্রবেশ করেছিল, তারপর একটি রজ্জু গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করেছিল। তার মৃত্যু সম্পূর্ণ হলে সেই রজ্জু তার ভার বহন করতে পারেনি, ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমিই আমার প্রতিদিন দিয়ে সেই মৃত্যু তিলতিল করে তৈবি করেছি আর প্রতিদিনের প্রেতলোকেই ঘটেছে সেই আত্মহনন। অথচ দেখো, আমার সারাটা শরীরে যাত্রার চিহ্ন, যেন, এই শবদেহ গ্রহণ করতে আমাকে একটা পুরো জীবন হাঁটতে হয়েছে ও দিশারিহীন সেই যাত্রায় মর্তলোক পেরিয়ে এই প্রেতলোকে পৌঁছুতে হয়েছে। আমি যে সত্যিই প্রেতলোকেই পৌঁছুতে চেয়েছিলাম, আর আমাকে যে সত্যিই প্রেতলোকে পৌঁছুতে দেয়া হয়েছিল, তার ছাড়পত্র এই স্বর্ণপল্লব। এক গাছের ঘন পাতায় লুকনো, প্রায় অদৃশ্য এক স্বর্ণশাখা। সে-শাখাকে ঘিরে রেখেছে এত অসংখ্য শাখা যে একমাত্র তার পক্ষেই এই স্বর্ণশাখাটি দেখা সম্ভব, যে শুধু এই স্বর্ণশাখাটিকেই দেখতে চায়। আমি নিশ্চয়ই আমারই চারপাশে আমারই দীর্ঘ আয়ু দিয়ে এই স্বর্ণশাখাটিকে দেখতে চেয়েছিলাম। মানুষ তার দেখা ও শোনার আকাঙ্ক্ষার নিশ্চয়তা হারিয়ে ফেলেছে। অথচ আমার অজ্ঞাতেও কতটা নিশ্চয়তা আমার আকাঙ্ক্ষাকে তৈরি করে তুলেছে, কোন এক অভাবিত ভবিষ্যে এই অভিজ্ঞানটি আমাকে দেখাতে হবে, অথবা আমাকে দেখতে হবে, নইলে, আমার প্রেতলোক প্রবেশ স্বীকৃতও হবে না, সম্পূর্ণও হবে না। কোনো কিছু সম্পূর্ণ করতে হলে তো তার একটা আরম্ভেরও প্রয়োজন থাকে। আমি সেই আরম্ভক্ষণ কোথায় চিহ্নিত করব? কবে, কখন,

কোথায় এই প্রেতলোকের নির্মাণ শুরু করেছিলাম? কবে, কখন, কোথায় এই যা-কিছু আমার দিনযাপন বর্ষযাপন আয়ুযাপনকে চিহ্নিত করে, সে-সব কিছুই হয়ে উঠছিল প্রেতের সঞ্চয়। আর, আমি সংগ্রহ করে রেখেছিলাম এই প্রবেশপল্লব।

আট

অজস্র পত্রপল্লব ও শাখাপ্রশাখায় ঢাকা সেই অসংখ্যবৃক্ষের কোনো এক বৃক্ষের ভিতর আমি চিনে নিয়েছিলাম নির্ভুল সেই স্বর্ণশাখা। মানুষ এখনো, কখনো-কখনো, তার জ্ঞানের নিশ্চয়তা ব্যবহার করতে পারে কিন্তু সেই আবিষ্কার কখন তারই অজ্ঞানে হয়ে ওঠে মৃত্যুলোকের প্রবেশক। সেই সোনার ডালের পাতাগুলি সব সোনার, তার পল্লবগুলি সোনার। এক অরণ্যে ঢেকে থাকা সেই স্বর্ণশাখা কেমন এক অবতামসে আচ্ছন্ন ছিল। অথবা হয়তো, নিজের দশদিকে এক ছায়াবলয়ের মাঝখানে সেই স্বর্ণশাখা এমন স্বর্ণিল হয়ে জেগে ছিল। এই শাখাটি ভেঙে নিলে, দ্বিতীয় এক স্বর্ণশাখার উদগম ঘটে। সেই দ্বিতীয় নবোদগত শাখায় গজিয়ে ওঠে সোনার পাতা। সেই প্রথম শাখা একমাত্র সে-ই ভেঙে নিতে পারে, যার নিয়তিতে প্রেতলোক প্রবেশ নির্ধারিত হয়ে আছে। নইলে কোনো শাণিত ফলক এ ডাল কাটতে পারে না, কঠিন পাথর এ ডাল ভাঙতে পারে না। কেবল যার শরীরের অদৃশ্য ছায়ায় প্রেতলোকের ইশারা থাকে, যারা ছায়ার ও প্রতিবিম্বের অর্থ পড়তে জানে, তারা, যার ছায়ায় ও প্রতিবিম্বে সেই প্রেতলোককে পাঠ করতে পারে, তার হাতের নিবিড়তায় এই ডালটি নেমে আসে, যে-নিবিড়তায় নেমে না এলে ডাল থেকে ফুল বা পল্লব চয়ন করা যায় না। মানুষকে এখনো তরুলতা ও বৃক্ষরাজি পাঠ করতে পারে, এখনো মানুষের ছায়া কত অনাগত ভবিষ্যের লিপিমালায় খোদিত হতে পারে, ও, এখনো সেই লিপিমালার ওপর অর্থময় সূর্যকিরণ অথবা ছায়ার বিনিময় ঘটতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত লুপ্ত অর্থের পাঠোদ্ধার যখন এক সম্পন্নতায় এসে সমাহিত হল বলে মানুষ মনে করে, তখনই সে আবিষ্কার করে, বা তখনই তাকে পরিণামের মত জেনে নিতে হয়, তার সারা শরীরে যে-অদৃশ্য বর্ণমালা খোদিত হয়ে গেছে, তা প্রেতের নখরচিহ্ন। সে নিজের চারপাশে শুধু এক প্রেতলোকই গড়ে তোলেনি, সে নিজেকেও সেই প্রেতলোকের যোগ্য করে তুলেছে। তার আত্মনির্মাণের সব উপকরণ সংগ্রহ শেষ পর্যন্ত সঞ্চিত হয়েছে শ্মশানের মাটির হাঁড়িতে।

নয়

আমি কোনো প্রিয়তমের শবানুগমন করে যমের পায়ে-পায়ে এই প্রেতলোকে পৌঁছইনি। আমি কোনো ভবিষ্যতের সভ্যতা নির্মাণের কর্মসূচি জানতে উপদেশনার প্রয়োজনে প্রেতলোকে আমার পিতার কাছে পৌঁছইনি। আমাকে কোনো বিরক্ত পিতা 'তোকে যমকে দিলাম' বলে ভর্ৎসনা করেননি ও সেই মিথ্যা পিতৃসত্য রক্ষার জন্যে আমি প্রেতলোকে আসিনি। আমি এক জীবনযাত্রার শেষে এই প্রেতলোকে এসে পৌঁছেছি, অথবা এক জীবনযাপনের শেষে এই প্রেতলোকের ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করেছি। মানুষ আর তার ভাষা দিয়ে তার নিজের অবস্থান জানাতে পারে না। আমিও পারছি না। কারণ, যে-সব পরম সত্য অন্বিত ও উচ্চারিত হয়ে মানুষের ভাষাকে এমন অর্থক্ষম করে তুলেছিল, সেই সব সত্য তার উচ্চারণও হারিয়েছে, অন্বয়ও হারিয়েছে। সত্য তাহলে অবিনশ্বর নয়? এমন কিছুই নেই, একবার উচ্চারিত হয়ে যাওয়ার পর যার আর ক্ষয় হয়নি? এমন কিছুই নেই, যা যখন উচ্চারিত হয়েছিল, তখন যতটা সত্য ছিল, এখনো ততটাই সত্য আছে? সত্যের তো কোনো অবশেষ বা উচ্ছিষ্ট বা ভগ্নাংশ হয় না। সত্য হয় সম্পূর্ণ, আর নয় তো অনস্তিত্ব। সত্যেরও তাহলে আয়ু থাকে, অনতিক্রম্য? সত্যেরও তাহলে মৃত্যু ঘটে? তার পর যা স্মরণে আসে, তা সত্যের প্রেত? মানুষ তো তার সব সত্য বলার মত শব্দ তৈরি করে উঠতে পারেনি। তাকে তবু সত্য বলতে হয়েছে, এক-কথা দিয়ে, আর-এক সত্য। আর সে যখন তা বলতে পেরেছে, তখন, সেই সত্য থেকে নতুন-নতুন শব্দ কুসুমিত হয়ে উঠেছে আবো সত্যের ধারণযোগ্য শব্দরূপে। মানুষ যখন বিশ্বাস করেছে, এক শব্দ থেকে আর-এক শব্দে সত্যের বিচ্ছুরণের এক ক্রমপ্রসরমাণ বলয়ের বিস্তারই বুঝি ঘটে চলেছে, তখন, হায়, মানুষ বুঝতেই পারেনি, বা, হয়তো বুঝতে পেরেও সেই অনুভবের সঙ্কেতকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, কারণ, মানুষ নিজে তার অনুভবকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে না-ফেললে আর-কে তা করবে, যে, মানুষের সত্যে গ্রহণ লেগে গেছে। সেই রাহুগ্রস্ত সত্য থেকে যা কিছু নতুন অর্থ নিষ্কাশিত হচ্ছে, তার সব কিছুতেই লেগে থাকছে রাহুর ছায়া।

দশ

যে-যাত্রা আমি অতিক্রমণ করিনি অথচ যে-যাত্রার শেষে এসে আমি পৌঁছেছি, সেখানে আমি দেখেছি, আমারই মত কত প্রেতাত্মা এক পঙ্কিল

নদীতীরে পারাপারের এক খেয়ার দিকে ছুটছে, একটু স্থান পাওয়ার আশায়। আমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব এই উদ্বাস্তু, নিরাশ্রয়, প্রেতকুলের মধ্যে আমার সেই প্রিয়তমকে খুঁজতে, যার শৈশবের মুখের লালা এখনো আমার বুককে ভিজিয়ে রেখেছে। এরা এই কাদার নদী পার হতে চায় কেন? ওপারে কি উদ্ধারের কোনো দেশ আছে? অথবা, এই খেয়াই এক উদ্ধারের খেয়া? অথবা, পরিত্রাণ, পরিত্রাণ, পরিত্রাণের এক বিকল্পহীন আকাঙ্ক্ষায় এরা তাড়িত হচ্ছে, এই প্রেতগণ, আর তারই মধ্যে আমাকে খুঁজে নিতে হবে আমার সেই প্রিয়তমকে? সেই কর্দমনদীর খেয়ার মাঝি বৃদ্ধ কিন্তু ঋজু ও পেশল। তার চোখ আঙারের মত রাঙা আর তার আলখাল্লার মত পোশাক প্রেতবাতাসে বারবার তার কাঁধ থেকে খসে-খসে পড়ছে। তার গলায় এক রুদ্ধ চিৎকার, যা শুধু নিষেধ করে। সে খেয়া পার করে কিন্তু কাউকেই যেন খেয়ায় উঠতে দেয় না। যে-লম্বা লগি দিয়ে সে কাদা ঠেলে তার সেই নৌকোকে কোন এক অনির্দিষ্ট পরপারের দিকে নিয়ে যায়, সেই লগি দিয়েই সে সেই ধাবমান প্রেতগুলিকে খেয়া থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সেই প্রেতদের মধ্যে আমি ছিলাম, আছি। আমিও দৌড়োচ্ছিলাম। আবার থমকে দাঁড়িয়ে খুঁজছিলামও। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না—আমি এখানে তাকে খুঁজছি, নাকী আমিও সেই কোনো নিরুদ্দিষ্ট পরপারের দিকে ছুটছি। সেই মাঝি, তার কর্দমাক্ত লগি তুলে, তার রক্তাভ চোখে আমারই পরিচয় জানতে চায়। আর, আমাকে তুলে ধরতে হয়, সেই স্বর্ণপল্লব, যা একদিন আমি চয়ন করেছিলাম, বা, যা একদিন দৈবনির্দেশে আমার কুসুমচয়নের ভঙ্গিময় আঙুলগুলির মধ্যে এসে পড়েছিল। যা ছিল আমার শ্রেষ্ঠ চয়ন, তাই কি হয়ে উঠল আমার প্রেতপরিচয়ের স্মারক? অথবা, আমার অধিকারের চিহ্ন? এ-প্রেতলোক রচনায় আমারও কিছু কৃত্য ছিল।

এগার

যে-প্রেতলোক আমারই নির্মাণ, আমার জীবনযাপন যে-প্রেতলোককে এমন স্থিতি দিয়েছে, অথচ, আমি নিজেই জানি না সেই প্রেতলোকের পরিধিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি, নাকী, আমাকে কেন্দ্র করেই সেই প্রেতলোক ব্যাপ্ত হয়েছে। সেই প্রেতলোকের দিকে আমার কোনো যাত্রা ছিল না, অথচ আমার নিশ্চিত তরণ ছিল, সেই প্রেতলোকে আমার অম্বিষ্ট আছে কিন্তু আমি জানি না সে অম্বিষ্টকে কোথায় খুঁজব? সেই প্রেতলোকে আমার সম্ভাষণ আছে কিন্তু

আমি জানি না সে-সম্ভাষণ আমি কাকে জানাব? আমার যাত্রা নেই, উদ্দিষ্ট নেই, সম্ভাষিত নেই। আমি জানি, আমার সেই প্রিয়তম, অসূর্যের দেশ থেকে হয়তো এই প্রেতলোকেই চলে এসেছে। কারণ, তাকে তো মৃত্যুতেও আমাকেই খুঁজতে হবে। মৃত্যুও তো এক আশ্রয়। আর, সে তো চিরকাল এই কথাই জেনে এসেছে, আমিই তার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। সে কি এ-কথাও জেনে ফেলেছিল, আমিই তার মৃত্যু? সে কি একথাও জেনে ফেলেছিল, আমি এই প্রেতলোকে পৌঁছে যাব, বা, আমি নিশ্চয়ই একদিন এই প্রেতলোককে চিনে নিতে পারব আমারই জীবনে? শোনা যায়, যারা প্রেত হয়ে যায়, তাদের আর জীবিত কোনো মানুষ চিনে নিতে পারে না। আমি যে চিনে নিতে চাই। এই প্রেতলোকের যদি কোনো শৃঙ্খলা থাকে আর এই প্রেতলোকের যদি কোনো অধিপতি থাকে, তাহলে তাকেই সম্ভাষণ করে কি আমার এই প্রার্থনা উচ্চারণ করব—এই আমারই নির্মিত প্রেতলোকে যেন তার জীবিত মুখখানি একবার আমি দেখে নিতে পারি, আর এই প্রেতলোকে তার সঙ্গে আমার যেন একবার জীবিত দৃষ্টিবিনিময় হয়। একবার, একবার শুধু, শেষবারের মত দেখে নিতে চাই—এই অগণন বৎসরের প্রাচীন পৃথিবীতে সে কোনো একদিন জীবিত ছিল। আমি এই প্রেতলোকের পরিধিতে, অথবা কেন্দ্রে, হয়তো আমার এই দীর্ঘ আয়ু অপেক্ষা করব। আমার সেই অপেক্ষার রাত্রির সমসংখ্যক বর কোনো দেবতা আমাকে দেননি। তবু এই একটি মাত্র বর আমি শূন্যতার কাছে প্রাথনা করছি—একবার তার জীবিত মুখখানি দেখাও, 'প্রথমং বরং বৃণে।'

বারো

এ প্রার্থনা কারো কাছে পৌঁছুবে না। মানুষ প্রার্থনা রহিত করেছে। এ-বর দেয়ার যোগ্য কোনো দেবতা নেই। মানুষ দিব্যকে ধ্বংস করেছে। এক মানুষই পারত মানুষকে বর দিতে। মানুষ নিজের সেই অধিকার অস্বীকার করেছে। মৃত্যু তার বিধি লঙ্ঘন করেছে। সে আমার জন্মের অনুজকে মৃত্যুতে অগ্রজ করে নিয়েছে। জীবন তার বিধি লঙ্ঘন করেছে। সে তার অনুজের জন্যে জীবনরচনার পরিবর্তে প্রেতলোক রচনা করেছে। জীবন যখন মৃত্যুর ওপর তার অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারত, তখন মৃত্যু জীবনকে এমন তুচ্ছ ও ভঙ্গুর করে মারতে পারত না। মৃত্যু সেই কোনো এক কালে মহৎ ছিল। সেই মহৎ কালে মৃত্যুও বরণীয় ছিল। সেই সব মৃত্যুতে কবিরা এমন শব্দমালা

ও প্রতিমা গেঁথে ও গড়ে তুলতেন, যা, পাথরে খোদিত না হয়েও পরবর্তী সহস্রাব্দ ও তারও পরবর্তী সহস্রাব্দ শুধু মানুষের উচ্চারণে অমরত্বের চাইতেও স্থায়ী অমরত্ব পেত—

দুধ খায়নি বলে একটা কাঠি তুলে দেখালে যে-বালক ভয় পেত, সে রাজছত্রধর হাতিটিকে মেরেই ক্ষান্ত থাকেনি, গতকাল যে-বীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়েছিলেন, তাঁরই এই বালকপুত্র জানতেও পারেনি, দেখতেও পারেনি, মরণতীর কখন এসে তাকে বিদ্ধ করেছিল। সে তার ঢালের উপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল —সেই বালক, যার শ্মশ্রু এখনো কোমল।

পিতাদের জন্যে এখন আর তেমন কোনো যুদ্ধক্ষেত্র থাকে না।

আর-যেন কোনো রাত্রি না আসে, আর যেন কোনো দিন না হয়। তার শিরস্ত্রাণে আমরা ময়ূরের পালক গুঁজে দিয়েছি আর অঞ্জলিতে সোমরস তুলে, ঢেলে, তার তর্পণ করেছি। সে কি আমাদের এই সব সংকার গ্রহণ করবে, সেই বীর, যে পর্বতসানু ঘেরা কটি দেশের প্রভুত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল?

পিতাদের জন্যে এখন আর তেমন কোনো প্রত্যাখ্যান থাকে না।

সে যদি এক পানীয় পেত, সে সে-পাত্র আমাদের দিত। যদি আর-একটু বেশি পেত, সে নিজেও পান করত ও গান গাইত। সে এখন কোথায়? সে যদি এক পাত্র অন্ন পেত সবাইকে ভাগ করে দিত। যদি আরো পেত, আরো ভাগ করে দিত। সে এখন কোথায়? যেখানে বর্শা ধেয়ে আসত আর বাণ উৎক্ষিপ্ত হত, সে সেখানে সবার আগে গিয়ে দাঁড়াত। সে এখন কোথায়? যে-বর্শা তার বক্ষ ভেদ করেছিল, যে-বর্শা কত দেশের কত চারণের আহারপাত্র ভেঙে দিল, কত আশ্রয় গুঁড়িয়ে দিল, সুন্দর সব শব্দান্বেষী কত কবির জিহ্বা ছেদন করল, সে এখন কোথায়? আমার রাজা, আমার ভর্তা, আমার সহায়? না, এখন আর কোনো চারণ নেই, সেই চারণদের পুরস্কার দেয়ারও কেউ নেই। ঠাণ্ডা জলে যেমন কুমুদ ফোটে, মধুময়, তারপর ঝরে যায়, এখনো তেমনি অনেকে বাঁচে আর মরে। কেউ কাউকে কিছু দেয় না।

পিতাদের জন্যে এখন আর তেমন কোনো দানপাত্র নেই।

সে ফুল দিয়ে নিজেকে সাজাত, তরুণ তরুর ফুল। সে কোনো ক্ষমতাসীনের কাছে নত হত না, সে কোনো দুর্বলকে আঘাত করত না। সে জানত না, কী করে চাইতে হয়। সে জানত না, প্রার্থীকে কী করে ফেরাতে হয়। সে গ্রসিষ্ণু সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াত, তারপর পলায়নপর শত্রু সেনাদের পেছন থেকে দেখত। সে এমন কথা বলত যা স্পষ্ট। সে এমন কথা বলত না, যা স্পষ্ট নয়। যা করার সে-সবই সে করে গেছে। এখন তোমরা তার ধড় থেকে মুণ্ডু কেটে নিতে পারো, অথবা যেমন আছে তেমনই রেখে দিতে পারো। এখন তোমরা ওকে সমাধি দিতে পারো, অথবা চিতায় তুলতে পারো। কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এই মানুষটিকে নিয়ে তোমাদের ইচ্ছাপূরণ করতে পারো। এই মানুষটি সুনাম ভালবাসত।

পিতাদের জন্যে এখন আর তেমন কোনো সমাধিক্ষেত্র নেই।

এখানে এখনো কেন জুঁই ফুল ফোটে? তরুণীরা ও-ফুল পরবে না। যাদের হাতে শাঁখা, তারা ও-ফুল ছোঁবে না। যারা গান গেয়ে বেড়ায় তারা চুল বাধতে ও-ফুল তুলবে না। সেই-যে একজন আমাদের বীর ছিল, যার হাতে একটা দীর্ঘ বর্শা ঝলসাত, যে তার পৌরুষ দিয়ে সবাইকে অন্য রকমের জয় এনে দিত, সে আর নেই।

পিতাদের জন্যে এখন আর তেমন কোনো ফুলমালা নেই।

কুমোর, ওগো কুমোর। সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে আমি তাকে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। তাকে এই বিরাট মাটিতে সমাধি দেব। তুমি আমাকে একটা মাটির কফিন তৈরি করে দাও। সেই কফিনটাকে একটু বেশি চওড়া করো, যাতে আমাদের দুজনকেই সেখানে ধরে।

পিতাদের জন্যে এখন আর তেমন কোনো শবশকট নেই।

সেই ঘোড়া আর ফিরে আসেনি। তার ঘোড়া আর ফিরে আসেনি। সব ঘোড়া ফিরে এসেছে। আমাদের সেই মানুষের ঘোড়া আর ফিরে আসেনি। সে আমাদের বাড়ির ছোট ছেলেটির বাবা ছিল। আমাদের ছেলের মাথায় একরাশ চুল। সেই ঘোড়াটি কি মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেই ঘোড়া কত-না যুদ্ধের

ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে গেছে। জোড়া নদীর ধারে সেই মহাদ্রুমের মত, ঘোড়াটি কি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল তাকে নিয়ে কোনো এক যুদ্ধে?

পিতাদের জন্যে এখন আর তেমন কোনো বাঁচন নেই।

তের

আমার এমন কোনো শব্দ নেই, যে শব্দ দিয়ে আমি তার মৃত্যুকে অমরত্ব দিতে পারি। আমার এমন কোনো উচ্চারণ নেই, যে-উচ্চারণ দিয়ে আমি তার বেঁচে থাকাকে জয়গাথা করে তুলতে পারি। শব্দহীন, উচ্চারণহীন, যুদ্ধহীন, জয়হীন, পরাজয়হীন আমি, আমারই জীবনযাপন দিয়ে তৈরি এই প্রেতলোকের অন্ধকার পরিধিতে, বা কেন্দ্রে, দাঁড়িয়ে কোন তমসার দিকে আমার এই দু হাত বাড়াব —সেই রজ্জুটির ফাঁস্ আমার হাতে তুলে দাও, যে-ফাঁস সে তার নিজের দুই হাতে নিজের গলায় পরেছিল মালার মত, তারপর, নিজের শ্বাস নিজে রুদ্ধ করতে সে ঝাঁপ দিয়েছিল শূন্যতায়, শূন্যতায়, শূন্যতায়। সেই ফাঁস, সেই ফাঁসটুকুকে আমি স্পর্শ করতে চাই।